নতুন ফসল

•

'নতুন ফসল'-এর
প্রথম পর্ব

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বিদ্যোদয়
লাইব্রেরী
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

পঞ্চম মুদ্রণ
১৩৬৭

প্রচ্ছদ
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ৮·৭৫

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

শ্রীভূপতি চৌধুরী

সুহৃদ্বরেষু

বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা' এই ট্রিলজিই সরোজকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এ বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও এই উপন্যাস তিনখানি যে সরোজকুমারের সার্থক সৃষ্টি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার ধর্মভিত্তিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিলুপ্তপ্রায় 'বাউল-সম্প্রদায়ে'র যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

মুশকিল হয়েছে, এই তিনখানি উপন্যাস যে একটি বিরাট উপন্যাসের তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড, এ তথ্য না জানায় অনেক পাঠকের পক্ষেই এই অপূর্ব গ্রন্থের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব হয়নি। 'ময়ূরাক্ষী' এর প্রথম খণ্ড। এখানে নায়িকা বিনোদিনী পল্লীসমাজের ভালো মন্দ সমস্ত সংস্কার নিয়ে কাটালো তার গার্হস্থ্য জীবন। সুখে-দুঃখে, আশা-নিরাশায় ভরা অপূর্ব সে জীবন-কাব্য।

সেই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল রসময় বাউলের আখড়ায়, যেখানে বন্ধন নেই, আছে শুধু অনন্ত মুক্তি। নারী সেখানে সেই পরম পুরুষের পূজার উপকরণ যিনি সকল রসের আশ্রয়। অনন্ত মুক্তির লঘুতম হাওয়া গৃহকপোতীর ডানায় যেন সাড়া জাগায় না। অত উঁচুতে ওড়া তো তার অভ্যাস নেই। তবু তাকে উড়তেই হয়। নিচে নামার উপায় কোথায়?

অবশেষে নিচে নামারও উপায় হল তার জীবনের তৃতীয় পর্বে। সুদূর উচ্চলোক থেকে যে সোমরস সে পান করে এল, পিতৃগৃহের পরিবেশে তা যেন তাকে নতুন করে, অপূর্ব করে সৃষ্টি করলে। 'সোমলতা'য় বিনোদিনী যেন এই পৃথিবী, কলঙ্কে ও মহিমায় তার আর তুলনা নেই।

ময়ূরাক্ষী চলে বয়ে।

শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষী। স্রোত তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একদিকে ধূ ধূ করছে বালুচর। কত পাখীর পায়ের দাগ তার উপর বিচিত্র আলপনা কেটে গেছে। চিহ্ন রয়েছে কত মানুষের পায়ের দাগের। কেউ জল নিতে এসেছে, কেউ গেছে। গত রাত্রের চক্রবাকী ফেলে গেছে একটি পালক। সেটি হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে। কর্মব্যস্ত মানুষের চোখে তার মূল্য নেই। দুটি পাখীর নিগূঢ় বিরহ-মিলন-কথার এই নীরব সাক্ষী কারও চোখেও পড়ে না। ক্ষয়-ক্ষীণ শীর্ণা ময়ূরাক্ষীতে এখন খেয়াঘাটে নৌকো নেই। খেয়া পারাপার বন্ধ। লোকে হেঁটে পার হচ্ছে। তারই চিহ্ন নদীতটে আঁকা। কাকচক্ষুর মতো নির্মল জলে এক টুকরো আকাশের ছায়া পড়ে। দিনে রৌদ্রোজ্জ্বল ধূসর আকাশ, অপরাহ্ণে গলিত স্বর্ণাভ, রাত্রে তারায় ভরা নির্মল নীল।

এদিকে গাঙশালিকে বাসা বেঁধেছে প্রকাণ্ড উঁচু পাড়ের গায়ে অসংখ্য গর্ত করে। সব গর্তেই কিছু গাঙশালিক নেই। কোথাও আশ্রয় নিয়েছে কটকটে কোলাব্যাঙ, কোথাও ইন্দুর, কোথাও বা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ। দূরের সুবিস্তৃত বটগাছের শিকড় এতদূর পর্যন্ত এসেছে। উঁচু পাড়ের মাঝামাঝি জায়গা থেকে সেগুলো যেন জটে বুড়ীর পিঙ্গল জটার মতো ঝুলছে।

নদীর এখানটায় জল নেই। মাত্র হাত তিনেক চওড়া অগভীর স্রোতধারা। কিন্তু খানিকটা উপরেই দহ। সেখানে গভীর জল। শীতল, নীলাভ, স্বচ্ছ। দেখলে ভয় করে। নিঃশব্দ, অচঞ্চল। মধ্যে একটা ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। তাতে জন্মেছে কচি ঘাস, অজস্র কুকসিমা আর ম্যালেরিয়া প্ল্যান্ট, ছোট ছোট বাবলার চারা, শেয়াকুলের জঙ্গল, আরও অনেক আগাছা। জায়গাটা খুব উর্বর। শশা, কাঁকুড়, পটল কিংবা বেগুন লাগালে প্রচুর হয়। কিন্তু লাগাবে কে? দহটা কুমীরে ভর্তি। শীতকালে চরে উঠে তারা দলে দলে রোদ পোহায়। নিজেদের মধ্যে খেলা করে। একবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে গুলি করে ক'টা মেরেও গেছেন। তার পর থেকে ওরা সতর্ক হয়ে গেছে। লোকজন ঢিল ছুঁড়লে হুড় হুড় করে জলে নেমে পড়ে।

দু-চারটে খুব বড় দুঃসাহসী কুমীরও আছে। তারা ডাঙায় উঠে অতর্কিতে গরুর পাল আক্রমণ করে ছোট ছোট বাছুরও মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে আসে। আর যদি কোনো জন্তু জল খেতে আসে তা হলে তো কথাই নেই। বড় বড় গরুকেও লেজের ঝাপটায় জলে ফেলবে। এই সব কারণে এদিকে লোকজনের আসা-যাওয়া কম। স্থানটি অধিকাংশ সময়েই নির্জন।

দূরে দুই তীরে যতদূর দেখা যায় মাঠের পর মাঠ। মাঝে মাঝে শশা-কাঁকুড়ের খেত। কোথাও কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা, কোথাও কোনো ঘের নেই। জন্তুদের উপদ্রবের হাত থেকে ফসল রক্ষা করবার জন্যে একটা লাঠির ডগায় কালো হাঁড়িতে খড়ি দিয়ে মানুষের মুখ এঁকে রাখা হয়েছে। অধিকতর উৎসাহী যারা তারা খড় দিয়ে মানুষই তৈরি করেছে। তার গায়ে দিয়েছে ছেঁড়া ন্যাকড়া, হাতে লাঠি। খেতের মাঝখানে কুঁড়ে বানিয়ে চাষী সেইখানে থাকে। রাতদিন ফসল পাহারা দেয়।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। কিন্তু এবারে এখনও বর্ষা নামেনি। ময়ূরাক্ষী তাই শীর্ণা, মাঠেও ফাট ফেটেছে। দূর থেকে ফাটলগুলি দেখলে মনে হয় যেন অতি বৃদ্ধা পৃথিবীর স্ফীত শিরা এঁকে বেঁকে সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করে আছে। দুরন্ত গ্রীষ্মে পৃথিবীর যেন নাভিশ্বাস উঠেছে। বিস্তীর্ণ মাঠে আপনার জীর্ণ দেহ প্রসারিত করে দিয়ে সে যেন শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে।

এমনি গরমই পড়েছে।

ময়ূরাক্ষীর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে যেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, দুপুরের হাওয়া ফুটন্ত কড়াই থেকে ওঠা বাষ্পের মতো কাঁপছে। গায়ে লাগছে আগুনের শিখার মতো। চারিদিকে মরীচিকার সৃষ্টি হয়েছে। সকালে রণকুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুপুরে ধুলোয়। লোক্যাল বোর্ডের রাস্তার ধুলো। কখনও উড়ছে হাওয়ায়, কখনও গরুর গাড়ির চাকায়। গ্রীষ্ম হলেও মানুষের কাজ বন্ধ থাকে না। গরুর গাড়িও চলে। দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে তার অস্বাভাবিক কর্কশ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা যায়। ওঠে প্রচুর ধুলো। সেই ধুলোয় মাঠ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এমনি করে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী। কোথাও গ্রামের কোল ঘেঁষে লাজনম্রা তনুদেহ কিশোরী বধূর মতো। কোথাও দিগন্তপ্রসারী ছায়াহীন শূন্য মাঠের মধ্যে দিয়ে অনশনক্ষীণা ব্রতচারিণী দেয়াসিনীর মতো। আবার দহের কাছে যেন স্থির-যৌবনা বিলাসিনীর মতো, তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল মৃত্যুর মতো লোভার্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একটুখানি ছায়া আছে এইখানে। এপারে কমলপুর, ওপারে ময়নাডাঙা। নদী ক্রমশ এইদিকে ভাঙছে। ময়নাডাঙা ক্রমে দূরে পড়ে যাচ্ছে। আম, জাম, তেঁতুল, অশ্বত্থের ফাঁক দিয়ে এপার থেকে ময়নাডাঙার বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। কেবল গ্রামপ্রান্তের বাগ্দীপাড়ার কয়েকখানি কুঁড়ে ঘরের কিছু কিছু দেখা যায় বলেই বোঝা যায় ওখানে ঘন ছায়ার অন্তরালে একখানি ছোট গ্রাম লুকোনো আছে। আর বোঝা যায় নদীতে জল ভরে যে কুলবধূরা কলসী কাঁখে ফিরে যায় তাদের দেখে। কৌতূহলী চোখে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে পায়ে চলা সরু পথ দিয়ে তারা ওই গ্রামে ফিরে যায়। এ পথে প্রত্যহ তারা যায়-আসে। তবু চিরনূতন। সুবিস্তীর্ণ মাঠে, ছায়াঘন বাগানে, নিয়ত প্রবাহিত নদীজলে কি যেন আছে, কিছুতে পুরোনো হয় না।

এদিকে, কমলপুরের দিকে, খেয়াঘাটের কিছু উপরেই স্নানের ঘাট। সরু এক ফালি রাস্তা উঁচু পাড় থেকে এঁকে বেঁকে ঘাটে নেমে এসেছে। স্নানের সময় সে রাস্তা মেয়েদের ভিজে কাপড়ের জলে এমন পিছল হয়ে থাকে যে নিতান্ত অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও সে পথে ওঠা-নামা করা কঠিন। মেয়েরা পারে। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তারা ঘাটে ঘড়া নামিয়ে বসে দাঁত মাজে, নিজেদের ঘরকন্না সুখদুঃখের গল্প করে, ওরই মধ্যে খেয়াঘাটে যারা পার হয় গুণ্ঠনের ফাঁকে তাদেরও দেখে নেয়। তারপর স্নান শেষ করে জলভরা ঘড়া কাঁখে নিয়ে ডান হাত দোলাতে দোলাতে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে আসে।

উপরেই একটা বহুকালের প্রাচীন বটবৃক্ষ চারিদিক ছায়ায় অন্ধকার করে আছে। তারই নীচে দিয়ে গ্রামে আসার পথ। আলপথে একটুখানি এসেই গ্রামের রাস্তা, আলের চেয়ে খানিকটা চওড়া। গ্রামখানি নিতান্তই ছোট। সকলেই চাষী গৃহস্থ। সম্মুখেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের শালের আগুনের ধোঁয়া অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। ওদিকে গ্রামের অপর প্রান্তে কয়েক ঘর হাড়ি-বাগ্দী বাস করে, গ্রাম থেকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট ছোট চালাঘরে।

কমলপুরে ভদ্রলোক নেই। তবে অবস্থার তারতম্যে বড় ছোট বিভেদ যে নেই তা নয়। এরা সকলেই নিজের হাতে চাষ করে। এদের গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা যা কিছু সবই চাষ নিয়ে। এবারে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে আছে। এমন সময়ে একদা রাত্রে অতর্কিতে নামল বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টি। এত বৃষ্টি যে তার জন্তে কেউ প্রস্তুত ছিল না। যেমন ঝড়, তেমনি জল। মানুষ খুশী হবার অবকাশ পেল না। ঘর দোর সামলাতেই বিব্রত হয়ে উঠল। কিন্তু খুশী হল ময়ূরাক্ষী। আসন্ন যৌবনের সম্ভাবনায় তার সমস্ত মন নৃত্য করে উঠল।

সাদা চোখে কিছুই বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ময়ূরাক্ষীকে যারা চেনে তারা জানল কিশোরী বধূর যৌবন জাগার আর দেরি নেই।

আগের রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। যেমন বৃষ্টি, তেমনি ঝড়, তেমনি বজ্রপাত। খড়ের চালে জল আর কাটে না। লোকে সমস্ত রাত্রি ছেলেপিলে বুকের মধ্যে নিয়ে এ-কোণ ও-কোণ করে কাটিয়েছে। ঝড়ের শন্ শন্ বিদ্যুতের কড় কড় শব্দে কেউ একটা কথা কইতে সাহস করেনি। কেবল নিঃশব্দে দেবতার উৎপাত সয়ে গেছে, যেমন নিঃশব্দে সয়েছে ধরণী।

এত বড় ঝড়-জলের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। প্রথম রাত্রে ঝড়ের কোনো লক্ষণই দেখা যায়নি। বরং হারাণ মণ্ডল নিশ্চিন্ত মনে তার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী বিনোদিনীর সঙ্গে প্রাত্যহিক কলহে নিমগ্ন ছিল। এমন সময় প্রথমে ঝড়, তার পরেই জল। হারাণ তার বড় ঘরের দাওয়ায় ছেলেটিকে কোলে নিয়ে শুয়েছিল। আর বিনোদিনী ছিল সামনের রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটিকে কোলে নিয়ে। প্রায় প্রত্যহই এক টুকরো উঠোনকে মধ্যস্থ রেখে দুজনে কলহ বাধে। প্রথমে জোরে, তারপরে তন্দ্রাকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের উদাত্ত কণ্ঠ ধীরে ধীরে ঝিমুতে ঝিমুতে কখন একসময় থেমে যায়। মীমাংসা যে কোনোদিনই হয় না তা নয়, হারাণ যেদিন হার মানে সেদিন হয়। নইলে হয় না, হবার প্রয়োজনও করে না। গত রাত্রে আর একটু পরেই হারাণ হার স্বীকার করত। ক্লান্তিবশতই হোক, আর বিনোদিনীর প্রতি আকস্মিক প্রীতির উদ্রেক হওয়ার জন্যই হোক, তার কণ্ঠ ধীরে ধীরে মিইয়ে আসছিল। প্রতিপক্ষের অনেক অভিযোগ, কোনোটা নীরবে কোনোটা বা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নিচ্ছিল। এমন সময় এল ঝড়। তালের শুকনো পাতাগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠল। কোথায় গেল কলহ, কোথায় বা জয়ের গৌরব, বিনোদিনীর অহঙ্কার রইল রান্না-ঘরের দাওয়ায় পড়ে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠল কেঁপে। ঘুমন্ত মেয়েটিকে টানতে টানতে তাদের একমাত্র শোবার ঘরের ভিতরে এসে আশ্রয় নিলে।

বিনোদিনীর দোষ নেই। হারাণ ছফুট লম্বা জোয়ান। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। দেহের রঙ্ মাজা কষ্টিপাথরের মতো। তাতে অপরিমিত শক্তি। তার পিতামহের ভয়ে ভর দুপুর বেলাতেও লোকে মাঠের পথে চলতে ভয় পেত। তার পিতা বেল-গাঁয়ের জমিদারদের লাঠিয়ালের সর্দার ছিল। দু-চারটে খুন জখম এবং পাঁচ-সাতটা ডাকাতি যে তার খাতায় জমার অঙ্কে ছিল না এমন বলা যায় না। কতকটা পুলিসের

উপদ্রবে, কতকটা কালধর্মে হারাণ পিতৃপিতামহের পেশা ছেড়ে কৃষিকর্মে মন দিয়েছে। কিন্তু তার চেহারা, বিশেষ করে ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনলে ভয় পায় না এমন লোক নেই। ঝড়ের শব্দ এবং জলের ঝাপটা দেখে তারই ভয় হল। প্রাণের জন্যে নয়, এই ঘরখানির জন্যে, আর স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্যে। তা বিনোদিনীর ভয় তো হবেই।

উপর্যুপরি ক'বছরই ফসল ভালো হল না। ধানে বছর যাবে না। খড় যা হল তাতেও গরু-মোষের বৎসরের খোরাক হবে কি না সন্দেহ। সেজন্যে ঘর আর ক'বছর ধরে ছাওয়াতে পারেনি। কোনো রকমে গোঁজাগুঁজি দিয়ে রেখেছে। এই বৃষ্টি আটকানো তার কর্ম নয়। চালের বাঁশও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক একটা ঝড়ের দমকা আসে, আর চাল মচ মচ করে উঠে, দেওয়ালের বাঁধন কেটে ওড়বার জন্যে লাফাতে থাকে। হারাণের ভয় হয়, এই বুঝি গোটা চালখানা উড়ে গিয়ে পিছনের ডোবার জলে পড়ে। আর জল? জলের তো কথাই নেই। চাল ভেদ করে বৃষ্টির জল অজস্র ধারায় ঘরের মেটে মেঝেয় পড়ল। এমন কি চারিদিকের দেওয়ালে পর্যন্ত বসুধারার রেখা আঁকতে লাগল।

এমনি ঝড়-বৃষ্টি কালরাত্রে গেছে। পথে পথে এখনও জলস্রোত বইছে। ফলসা গাছের পাতাগুলি এখনও থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠছে। খড়ের ঘরের চালগুলি গত রাত্রের সংগ্রামের পর অসাড়ে ঝিমুচ্ছে, তার যেন আর সংজ্ঞা নেই। নদীর ধারের পুরোনো বটগাছের একটি মোটা ডাল ভেঙে গেছে। সেখানে জমা হয়েছে কৌতূহলের বশে একদল ছেলে, আর আহারের লোভে একপাল ছাগল। রসিক পাল এবং আরও অনেক লোকের বাড়ির পাঁচিল স্তূপাকারে পথের উপরে ভেঙে পড়েছে। সে সব জায়গায় এক হাঁটু কাদা। রাস্তা থেকে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এখন আর পাঁচিল দেবার উপায় নেই। এরা সব তালের পাতা কেটে বেড়া দিয়ে অন্দরের মর্যাদা রক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আর ভিতরে মেয়েরা তখন এই কুকার্যের জন্যে বৃষ্টির দেবতাকে একাদিক্রমে তারস্বরে গাল পাড়ছে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, জটে বুড়ীর পতিত ঘরখানার চালও নেই, কিছুই নেই। কিন্তু সেখানার কোনো দেওয়ালের এতটুকু মাটি খসে পড়েনি।

রসিক পালের স্ত্রীর সেইটেই হল বেশী রাগের কারণ। সেই রাগে একচোখো দেবতার প্রাতর্ভোজনের ব্যবস্থাটা মন্দ করলে না।

হারাণ মণ্ডলের কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তার উঠোনের এক কোণে একটা

মস্ত বড় আমড়া গাছ আছে। তারই পাতায় আর ডালে উঠোনটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। বিনোদিনী একগাছা ঝাঁটা নিয়ে উঠোন সাফ করছিল। আর হারাণ একখানা কোদাল নিয়ে উঠোনের জলনিকাশের পথ করছিল।

বৃষ্টি নেই বটে, কিন্তু আকাশ মেঘে থম থম করছে। সকাল থেকে একটি বারও সূর্য ওঠেনি। আবার হয়তো যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির ভয় চাষীরা করে না। গেলবারে সুবৃষ্টি না হওয়াতেই এত দুঃখ। ভয় কেবল ভালো করে ঘর ছাওয়ানো নেই বলে। ভয় কচিকাচা ছেলেদের জন্যে। ভয় নিরাশ্রয় হওয়ার। নইলে চাষী বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় পায় না। বৃষ্টিতে ভেজাতেই তার আনন্দ।

হারাণের বাড়িতে জঞ্জাল বড় বেশী জমেনি। একঘণ্টার মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে গেল। হারাণ হাত ধুয়ে এসে তামাক সেজে বড় ঘরের দাওয়ায় একটা পা ঝুলিয়ে বসে তামাক খেতে লাগল। ওদিকের রান্নাঘরের দাওয়ায় তখন তার ছেলেমেয়ে এক একটা করে বড় বড় বাটিতে গুড়মুড়ি খাচ্ছিল। তাদের মুখে পেটে পায়ে গুড় লেগেছে প্রচুর। তারই লোভে অজস্র মাছি সেখানটায় ভন ভন করছে।

বিনোদিনীর কাজ তখনও শেষ হয়নি। সে কোমরে পাট করে কাপড় জড়িয়ে উঠোনের পাতাগুলো এক কোণে জড়ো করে রাখছিল। সেখান থেকে সার গড়েতে ফেলে দিয়ে আসবে। আসছে বছর এই পাতা পচে জমির সার হবে।

আকাশের মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। সূর্য দেখা না গেলেও তার আভা এসে পড়েছে সজল গাছের পাতায়, ভিজে মাটিতে, নেড়া দেওয়ালে। সেই চমৎকার আলোয় গ্রামখানি হাসছে কি কাঁদছে বোঝা যাচ্ছে না।

সেই আলো এসে পড়েছে বিনোদিনীর মুখের উপর। বয়স তার উনিশের বেশী নয়। বর্ণটি চিকণ শ্যাম। দেহ ছিপছিপে একহারা। কিন্তু দক্ষিণ হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে এলিয়ে পড়বার মতো নয়। তাকে খাটতে হয়। প্রভাত থেকে রাত নটা পর্যন্ত। তাই তার দেহের গড়নটি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সকালের আলোয় মুখখানি তার চমৎকার দেখাচ্ছিল। প্রভাতের আলোয় যেমন ঝিকমিক করে ঢালু জমির জলে ধোয়া কচি ঘাস। ওর মুখে এখন আর গত রাত্রের কলহের চিহ্নমাত্র নেই। বরং যেন হাসছে।

বিনোদিনী সমস্ত দিন বেশ থাকে। খাটে খোটে, রাঁধে বাড়ে, সকলকে খাওয়ায় খায়, অবসর সময়ে গুন গুন করে একটু বা গানও গায়। কিন্তু সন্ধ্যের

পর থেকেই তার বুকে জগদ্দল পাথরের মতো কি যেন চাপে। অসীম বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠে। কিছু ভালো লাগে না। ছেলেমেয়ের কল কাকলী, স্বামীর প্রিয়বাণী সমস্ত বিস্বাদ ঠেকে। কথায় কথায় ছেলেমেয়ে দুটি ধমক খায়, মার খায়। খেয়ে চেঁচায়। স্বামীর ভালো কথাতেও সে ফোঁস করে ওঠে। কলহ বাধে। নিদ্রায় অচেতন না হওয়া পর্যন্ত সে কলহের আর নিবৃত্তি হয় না। পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অথচ সকালে আর দেখে চেনা যায় না। কথায় কথায় হাসি, চলায় চলায় চঞ্চলতা। চপল আঁখিতারা কেবলই যেন চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যেতে চায় নিরুদ্দেশে। কি যেন সুরের ছোঁয়া লেগে মন তার ক্ষণে ক্ষণে গানে গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

হারাণ হেসে বললে, আমাদের তো এই। বহু লোকের ঘর দোর পড়ে গিয়েছে।

বিনোদিনী ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেললে। তাদের খিড়কির তেঁতুলতলা থেকে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে রসিক পালেব দুর্দশা।

বললে, লক্ষ্মীর বাপের অবস্থাটা একবার দেখে এস।

বলে উচ্ছ্বসিত হাসি চাপবার জন্যে বিনোদিনী মুখে আঁচল চাপা দিলে।

হারাণ তামাক খেতে খেতে চমকে উঠল। বিনোদিনীর নিটোল ঠোঁট রসের ভারে টুল টুল করছে। আঁট করে জড়ানো শাড়ী তার দেহযষ্টির ভাঁজে ভাঁজে বসে আছে। তার ফাঁক দিয়ে আভাস জাগছে দুটি পরিপুষ্ট সুগঠিত উরুর।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। মনে হল এ বয়সে এ মেয়ে ঘরে আনা উচিত হয়নি।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বিনোদিনী সলজ্জভাবে চোখ নামিয়ে নিলে। ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসিও ফুটল। অনাবশ্যক গায়ের কাপড় ঠিক করে নিয়ে আবার বললে, ওদের রাস্তার দিকের পাঁচিলটা পড়ে গিয়েছে। আর লক্ষ্মীর মা যা গাল পাড়ছে!

হারাণ ওর লজ্জা দেখে নিজেকে সামলে নিলে। বললে, গাল পাড়ছে? কাকে?

—ভগমানকে।

হারাণ হেসে বললে, লক্ষ্মীর মায়ের পাল্লায় পড়েছে। এইবার ভগবান জব্দ হবে।

বিনোদিনী খিল্ খিল্ করে হেসে বললে, তেঁতুলতলা থেকে শুনে এলাম,

কী গালই পাড়ছে! ভগমান কি আর আছে? এতক্ষণ কানে আঙুল দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

হারাণ হেসে ফেললে। বললে, আর রসিক পাল?

—সে কি করছে তা জানি না।

হারাণ হুঁকোটা এক কোণে ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে বললে, রগড়টা গিয়ে একবার দেখে আসিগে। তোদের খাওয়া এখনও হল না রে?

ছেলেমেয়ে দুটো,—হাবল আর মেনী,—তখন মুড়ির সৎকার সমাধা করে বাটির জলটুকু চুমুক দিয়ে খাচ্ছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তরে শুধু একবার বাটির আড়ালে আড়চোখে চাইলে।

বিনোদিনী পিছন থেকে বললে, সেইখানে গিয়ে যেন জমে যেও না। ফিরে এসে দুটো ডুমুর পেড়ে দিতে হবে, আর আমড়া।

—আচ্ছা।

—আর দেখ, যদি ছোট চিংড়ি দেখতে পাও, আধ কাঠার কিনো। আমড়ার সঙ্গে মজবে ভালো।

আর একটা আচ্ছা বলে হারাণ রসিক পালের দুর্দশা উপভোগ করবার জন্যে চলে গেল।

ভোর থেকেই বিনোদিনীর বড় খাটুনি গেছে।

উঠেছে কোন্ ভোরে, তখনও সূর্য ওঠেনি। চৌকাঠে জল দিয়েছে। ঘর দোর নিকিয়েছে। উঠোনে নামবার উপায় ছিল না, সেজন্যে সেখানে আর মেড়ুলি দেওয়া হয়নি। গোয়াল থেকে গরু বার করে বাইরের গোঁজে গোঁজে বেঁধেছে। গরুগুলোকে খেতে দিয়েছে অবশ্য হারাণ। কিন্তু গোয়াল সাফ করেছে সে। তার পরে হাত ধুয়ে হাবলকে আর মেনীকে মুড়ি বার করে দিয়ে উঠোন সাফ করতে লেগেছিল। এখনও অনেক কাজ বাকি।

উঠোনের পাতাগুলো সারে ফেলে দিয়ে এসে বিনোদিনী গোয়ালের গোবর সানতে বসল। গোয়াল পরিষ্কার করবার সময় সমস্ত গোবর সে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছিল। সেইগুলো গোয়ালের পিছনের দেওয়ালে ঘুঁটে দিতে লাগল।

হারাণ বেশ সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। তার বিঘে পঞ্চাশ জমি, দুখানা লাঙলের চাষ। বাইরে ছটা গোলা ধানে ভর্তি। খামারটা খড়ের পালায় বোঝাই থাকে। কিন্তু গত দুবৎসর ভালো ফসল না হওয়ায় একটু জেরবার হয়ে পড়েছে। গোয়ালে তার গরু ছিল অনেক। কতক বিলি করে দিয়েছে। যা আছে তারও

গোবর কম হয় না। কিন্তু বিনোদিনী কাজেকর্মে বেশ চটপটে। বেশী সময় ঘুঁটে দিতে লাগল না।

কাজ শেষ করে পুকুরঘাটে গেল হাত ধুতে। তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রসিক পালের বাড়ির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। রসিকের স্ত্রী এখনও চীৎকার করছে। কিন্তু এখন আর দেবতাকে গাল নয়, নিজের পুত্রবধূকে। বিনোদিনী উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা করলে।

এমন সময় রসিকের স্ত্রী নিজেই একটা ঘড়া কাঁখে নিয়ে তাদের খিড়কিতে বেরিয়ে এল। দুজনের এবং পাশাপাশি আরও অনেকের এই একই খিড়কি। এপারে বিনোদিনীদের ঘাট, ওপারে ওদের। রসিকের স্ত্রীর কাপড়ও কোমরে বেড় দিয়ে বাঁধা। পা পড়ছে দুম দুম করে মাটি কাঁপিয়ে। বিনোদিনী চেয়ে দেখলে, মুখখানা তার গত রাত্রের মেঘের মতো অন্ধকার। সে যেন কোনো দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখেই না।

সে মুখ দেখে বিনোদিনী প্রথমেই তার পাঁচিল পড়ার কথাটা তুলতে ভয় পেলে। বললে, কাল রাত্রে কী বিষ্টি দিদি! সমস্ত রাত এ-কোণ ও-কোণ করে কাটিয়েছি।

কথাটা পালজায়াকে বোধ হয় একটু আনন্দ দিলে। তবু মুখখানা তেমনি অন্ধকার করেই উত্তর দিলে, আর এ-কোণ ও-কোণ বোন! আমাদের তো···

—শুনলাম বটে।

রসিকের স্ত্রী তার দিকে পাশ ফিরে বসে পিতলের ঘড়াটা জোরে জোরে মাজতে লাগল।

বিনোদিনী হাসি চাপবার জন্যে জল নিয়ে অনাবশ্যক কুলকুচি করতে লাগল।

একটু পরে রসিকের স্ত্রী আড়চোখে বিনোদিনীর দিকে একবার চেয়ে বললে, আমার হাড় জালিয়ে খেলে মোড়ল বৌ। ওদিকে মুখ পোড়া দেবতা চোখের মাথা খেয়ে মরছে, আর এদিকে লেগেছে ওই আবাগীর বেটী, সর্বনাশী!

এই সর্বনাশী, অভাগীর কন্যা যে তার পুত্রবধূ ছাড়া আর কেউ নয় এ কথা বুঝতে বিনোদিনীর দেরি হল না। কিন্তু তখন বাড়ির ভিতরে হাবলে আর মেনীতে কিছু একটা কাণ্ড করে দুজনেই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তবু এত বড় প্রীতিকর প্রসঙ্গ ছেড়ে তার পা যেন নড়তে চায় না।

রসিকের স্ত্রীকে উজিয়ে দেবার জন্যে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বললে, বটে।

—ঘরের ধান চাল, মায় কাঁথের ঘুঁটে পর্যন্ত বিক্রি করে বাপের বাড়ি পাঠাবে। আর শুনবে গুণের কথা?

বিনোদিনী বিস্ময়ে গালে হাত দিলে।

—আবার চোপা কত! আমার মান্‌কেকে এমন করে মেরেছে বোন, পিঠে পাঁচটা আঙুলের দাগ বসেছে।

আমার মানিক কিন্তু ওই পুত্রবধূরই সন্তান। বছর আষ্টেক বয়স। গুণের তার সীমা নেই। সর্বদা গাছে গাছে, জলে জলে ঘোরে।

বিনোদিনী আবারও গালে হাত দিয়ে বললে, অবাক করলে মা! ওইটুকু একরত্তি ছেলের গায়ে আবার কেউ হাত তোলে!

—তবেই বল ভাই, অমন বৌকে ছাই গাদায় আঁশবঁটি দিয়ে কাটতে হয় না?

বিবেক থাকতে অত বড় অনুমতি বিনোদিনী দিতে পারলে না। তার আর পুকুর ঘাটে অপেক্ষা করারও উপায় ছিল না। হাবল আর মেনী চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করে তুলেছে। এখান থেকেই বিনোদিনী অনুমান করতে পারছিল, তারা দুজনেই দাওয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি দিচ্ছে। ভিজে দাওয়া। হয়তো সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত করেছে।

বিনোদিনী আর অপেক্ষা করতে পারলে না।

গিয়ে দেখলে যা আশঙ্কা করেছিল তারও চেয়ে বেশী। কাদায় দুজনের অঙ্গে আর এতটুকু স্থান অবশিষ্ট নেই। বিনোদিনী দুজনের ডানা ধরে তুলে পুকুরঘাটে এনে ফেললে।

ওদিকে চেয়ে দেখলে রসিকের স্ত্রী চলে গেছে। বিনোদিনী হতাশ ভাবে দুজনের গায়ের কাদা ধুয়ে দিতে লাগল।

—কি হচ্ছে হাবলের মা?

করুণ কণ্ঠস্বর। বিনোদিনী চেয়ে দেখলে পালেদের খিড়কিতে মানিকের মা। শাশুড়ীর বকুনির চোটে চোখ ছল ছল করছে। মানিকের মা বয়সে বিনোদিনীর চেয়ে কিছু বড়ই হবে। কিন্তু শাশুড়ীর আওতায় ছোট হয়ে আছে।

বিনোদিনী হেসে বললে, এই দেখ ভাই কাণ্ড!

মানিকের মা ভারি গলায় বললে, অমন কাণ্ড রোজই দেখছি ভাই। তবু তোমার ভাগ্যি ভালো যে শাশুড়ী নেই।

—যা বলেছ! আজ কেমন হল?

বিনোদিনী মুখ টিপে হাসলে।

মানিকের মা আকাশের দিকে চেয়ে বললে, খুব। আজ কেন ভাই, চৌদ্দ বচ্ছর এসেছি, সেদিন থেকে রোজই খুব হচ্ছে।

—ওই বালাইটি নেই ভাই, বেঁচেছি।

—তাই তো বললাম।

কি কথা মনে পড়ায় বিনোদিনী হঠাৎ বললে, বেঁচেছি আর কই ভাই! শাশুড়ী নেই, তার ছেলে আছে।

মানিকের মা ঠোঁট টিপে হেসে বললে, জালিও না যাও। সে ঝগড়া, আর এ ঝগড়া!

কিন্তু মানিকের মায়ের কথায় বিনোদিনী হাসলে না। ওর হাসি যেন বিনোদিনীর বুকে চাবুক মারলে। বিনোদিনীর বুকে, আর তার অদৃষ্টকে। মানিকের মায়ের খেয়াল নেই হারাণের বয়স কত। কিন্তু বিনোদিনী ভুলতে পারে না। তার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে বিনোদিনী কোনো রকমে মুখ নামিয়ে বললে, কি জানি ভাই।

কিন্তু বিনোদিনীর মনের দুঃখ মানিকের মা বুঝলে না। চোখে একটা কটাক্ষ হেনে ঠোঁটে বাঁকা হাসি টেনে বললে, আহা, কিছুই যেন জানেন না। কচি খুকী।

বিনোদিনী মুখ নামিয়ে শুধু একটু হাসলে। ছেলেটাকে লক্ষ্য করে বললে, এইবার যাও। ফের যদি কাদা মাখ, দেখিয়ে দোব মজা।

ছেলেটা এবং তার পিছনে পিছনে মেয়েটা বাড়ির দিকে দৌড়ল। মানিকের মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বিনোদিনীও বাড়ি এল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। কিন্তু শুধু সেজন্যে নয়। একটুখানি বাঁকা হাসি দিয়ে মানিকের মা তার চোখে স্বপ্নের অঞ্জন বুলিয়ে দিয়েছে। মনে তার একটুখানি দোলা লেগেছে। একটুখানি সুখের ছোঁয়াচ। মানুষের সঙ্গ থেকে সে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে দূরে থাকতে চায়। একলা। সমস্ত কাজের মধ্যে থেকে মন তার আপন মনে গুনগুনিয়ে উঠবে। সেই অবসরে নিজের জন্যে সে রচনা করবে ছোট্ট একটি স্বপ্নলোক। লূতাতন্তুর মতো রহস্যময়। শিশিরবিন্দুর মতো টুলটুলে।

কিন্তু কোথায় দোসর স্বপ্নলোকের? এর মধ্যে হারাণকে সে আনতে পারবে না। ওর সঙ্গে তার আত্মার কোথাও যেন মিল নেই। কিছুতেই মিল নেই। ও যখন ঝগড়া করে বিনোদিনীর এতটুকু বিসদৃশ মনে হয় না। ওর সঙ্গে যেন ঝগড়া হওয়াই স্বাভাবিক। ঝগড়া করে যখন মন ক্লান্ত হয়ে আসে তখন কেমন যেন আরাম বোধ করে। বরং বিব্রত লাগে যখন হারাণ ভালবেসে প্রিয় কথা বলতে আসে। সমস্ত মন তখন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। হারাণের বাহু যেন সরীসৃপের মতো

তাকে বেড় দিয়ে ধরে। ভয়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, শরীর কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে যায়, সে যেন মরিয়া হয়ে আপনার অসাড় মৃতদেহ হারাণের হাতে সঁপে দেয়। তার সুখস্বপ্নে হারাণের স্থান নেই।

হারাণ নয়, তবে কোথায় তার কল্পলোকের সাথী ?

মেঘ কেটে গিয়ে চনচনে রোদ উঠল। মেঘভাঙা রোদ, যেন সহ্য করা যায় না। হঠাৎ আলোর ঝলক পেয়ে গাছের পাতাগুলো যেন গা ঝেড়ে চাঙ্গা হয়ে বসেছে। খড়ের চালগুলোও আলোর ছোঁয়ায় হেসে উঠল।

বিনোদিনী ঘরের ভিতর থেকে দুখানা তালপাতার তালাই বের করলে। ঘরে চাল কমে এসেছে। কিছু চাল না করলে চলবে না। যে রকম বর্ষা আরম্ভ হল, এই সময় কিছু বেশী ধান না ভানতে পারলে বর্ষায় চাল করার সুযোগ বেশী নাও মিলতে পারে। এই ভেবে কয়েক হাঁড়ি ধান সে কাল সিদ্ধ করেছিল। রোদ দেখে উঠোনে তালাই পেতে সেগুলো শুকোতে দিতে লাগল। দুখানা তালাইয়ে ধানগুলো ঢেলে পা দিয়ে সেগুলো মেলে দিতে দিতে গুন গুন করে কি একটা গানের কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল।

অনেক দিন পরে আজ তার মনে গান এসেছে। ছেলেবেলায় বিনোদিনী বেশ মিষ্টি গাইতে পারত। তার বাপের বাড়ির পাশেই দুঘর বৈষ্ণবের বাস। গান গেয়ে ভিক্ষে করা তাদের ধর্মের অঙ্গ। তাদের বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই গাইতে জানে। একটি মেয়ে ললিতা, তার সঙ্গে বিনোদিনীর খুব ভাব। দুজনে একই বয়সী। ললিতার বাড়ির পাশে নিমগাছটি বেড়ে যে মোটা মাধবীলতা উঠেছিল, তারই গুঁড়িতে দোল খেতে খেতে একদা দুজনে কত গানই গেয়েছে। এতদিন পরে সে সব গানের সব কিছু তার মনে নেই। সেই বিস্মৃত গানের একটি কলি উজান বেয়ে এতদিন পরে আজকে হঠাৎ তার মনে ভেসে এসেছে। তারও অর্থ গেছে হারিয়ে। সুরের মধুতে অর্থ গেছে একেবারে তলিয়ে। সুর, শুধু সুর, বিনোদিনীর চারদিকে আজকে হঠাৎ কেবলই সুরের তরঙ্গ বয়ে চলেছে!

হঠাৎ বাইরে সদর দ্বারে একতারা বেজে উঠল।

ধান মেলে দিতে দিতে বিনোদিনী শিউরে থমকে গেল। তার মনে হল বাইরে সদর দ্বারে একতারার ঝঙ্কার উঠল না, উঠল তার দেহের শিরায়, রক্তে রক্তে, কাঁপন জাগিয়ে।

নিতাই প্রেমের বাজারে
অবাক হই হেরে।

বিনোদিনীর দেহলতা থর থর করে কেঁপে উঠল। উষ্ণ নিশ্বাস বইতে লাগল।
গৌরহরি বাবাজি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে গাইতে লাগল :

নিতাই প্রেমের বাজারে
অবাক হই হেরে।
ছুঁচের ছিদ্র মজার কথা
ও সে পার করে গজবরে ॥
একটা পাকা সজনে গাছে,
জোড়া আম ধরে আছে,
আমের ভিতর জামের আঁটি
জাম ধরে তাতে।
তার ভিতরে মায়া নদী
ও সে হেমনদীতে প্রেম ঝরে ॥
একটা সাপ আর নেউলে,
একটা ইন্দুর বেরালে,
এক ঘরেতে বসত করে
একই মেশালে।
তা দেখে এক মরা হাসে
সে 'হা গোবিন্দ' রব করে ॥

একতারার শেষ ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গান থেমে গেল। কিন্তু চারিদিকের হাওয়ায় তখনও যেন সুরের গুঞ্জন থামেনি। গৌরহরি মাটির দিকে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। বিনোদিনীর মাথার ঘোমটা কখন খসে গেছে। থেমে গেছে তার কাজ। ঘনপল্লবভারাতুর আমিলীতে দুচোখে সে যে কী দেখছিল সে নিজেও জানে না।

একটু পরে তার সংবিৎ ফিরে এল।

বড় ঘর থেকে চাটাই এনে দিলে গৌরহরিকে বসতে। উঠোনের ঘড়া থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে দিলে তাকে পা ধুতে।

গৌরহরি ব্যস্তভাবে বললে, থাক, থাক। পা ধুয়ে আর কি হবে? আমাকে পাঁচ বাড়ি বেড়াতে হবে।

বিনোদিনী আর জেদ করলে না। অদূরে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ললিতা ভালো আছে?

গৌরহরি ললিতার দাদা। তার চেয়ে বছর ছয়েকের বড়। বাপ তাদের আগেই মারা গিয়েছিল, বছর কয়েক হল মা'টিও গেছে।

বিনোদিনীর প্রশ্নে গৌরহরি ঘাড় নেড়ে জানালে, আছে।

—তোমার কাছেই আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গৌরহরির কষ্ট হচ্ছিল। কোনো রকমে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

বিনোদিনী ও-সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করলে না। সেও যেন লজ্জা বোধ করছিল। ললিতার জীবনের সে একটি ইতিহাস।—

রসময় ললিতার মামার বাড়ির দেশের লোক। ছোটবেলায় রসময়ের সঙ্গে ললিতার ভাব ছিল। নিতান্ত ছেলে বয়সের ভাব নয়। তারপর হঠাৎ ললিতার মা কোনো কারণে রসময়ের উপর চটে যায়, এবং এক রকম জোর করেই ললিতার সঙ্গে পাশের গ্রামের বলরামের বিয়ে দেয়। পাত্র হিসেবে বলরামের সঙ্গে রসময়ের তুলনাই হয় না। রূপ এবং যৌবন ছাড়া রসময়ের আর কোন মূলধনই ছিল না। কিন্তু বলরাম সম্পন্ন গৃহস্থ-সন্তান। তার বয়স রসময়ের চেয়ে বেশী হলেও সেখানে আজীবন সুখে থাকার ব্যবস্থা ছিল। পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি ছাড়াও বলরামের নিজের রোজগার ছিল। সে একটা বড় কীর্তনের দলের ডাইনের দোহার ছিল। তাতে নগদে এবং জিনিসপত্রে দুপয়সা আসত। কিন্তু অত সুখ ললিতার অদৃষ্টে সইল না। বিয়ের বছর দুই পরে একদিন সর্বাঙ্গে কঞ্চির চিহ্ন সম্বল করে মায়ের কুটিরে ফিরে এল, এবং তার দিন দুই পরে আবার কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। খবর নিয়ে জানা গেল সে রসময়ের আখড়ায় গিয়ে উঠেছে। শুনে গৌরহরির মা মৃত্যুকালেও একবার কন্যার নাম করলে না। গৌরহরিও কোনো কথা বললে না। কিন্তু ললিতাকে সে সত্যিই বড় ভালবাসত। দুজনে অনেক ভাব অনেক ঝগড়া করেছে। মায়ের মৃত্যুর পর অল্প কিছুদিন গৌরহরি গ্রামেই রইল, তারপর একদিন স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্যে বৃন্দাবন যাত্রা করলে।

বিনোদিনীর সঙ্গে তারপর এই প্রথম সাক্ষাৎ।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, বৃন্দাবন থেকে কবে ফিরলে?

—দিন তিনেক।

কিছুকাল আগে বিনোদিনী বাপের বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছে তার কুঁড়ে

ঘরখানির আর চিহ্নমাত্র নেই। অমন ঝকঝকে তকতকে উঠোন ঘাসে আর আগাছায় ভরে গেছে। কেবল নিমগাছটির আলিঙ্গনে থেকে মাধবীলতা এখনও তেমনি ফুল দিচ্ছে। কিন্তু তার নীচের সে বেদীটিও নেই, পাশের সে তুলসীমঞ্চও নেই।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় উঠেছ?

গৌরহরি হো হো করে এমন হেসে উঠল যে বিনোদিনীর আপাদমস্তক শিউরে উঠল। ঠিক ছেলেবেলাকার মতো হাসি। বিনোদিনী আর ললিতা জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে যখন বনফুল তুলত, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আচমকা এমনি জোরে হেসে উঠত।

গৌরহরি হেসে বললে, পথে।

বিনোদিনী চুপ করে রইল। একটু কি যেন ভাবলে। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, বৃন্দাবন থেকে আবার ফিরলে যে? ভালো লাগল না?

গৌরহরি হেসে বললে, রাধারানী পাঠিয়ে দিলেন।

কথাটা বিনোদিনী বিশ্বাস করলে না। মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলে।

গৌরহরিরও তা চোখে পড়ল। কিন্তু যেন পড়েনি এমনিভাবে এক পা বাড়িয়ে বললে, তা হলে আসি বিনোদিনী। যদি এদেশে থাকি আবার দেখা হবে।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বললে, দাঁড়াও। ভিক্ষে নিয়ে যাবে না?

গৌরহরি দাঁড়াল।

কিন্তু বিনোদিনী ভিক্ষে দেবার জন্যে ঘরের মধ্যে গেল না। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

বললে, যদি এদেশে থাকি আবার কি কথা? আবার কোথাও যাবে না কি?

—গেলেই বা ক্ষতি কি? এখানে আমাকে বেঁধে রাখবার তো কিছুই নেই।

বিনোদিনী মুখ নীচু করলে।

কিন্তু তার কথার পূর্বানুবৃত্তিতে গৌরহরি বলতে লাগল, ছিল তো একখানি মাটির ঘর, তাও মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে।

—আবার ঘর করতে কতক্ষণ?

গৌরহরি জিভ কেটে বললে, আবার? বাঁধন যদি কেটেছে তো আর নয়।

বিনোদিনী দুষ্টুমিভরা চোখে হাসলে।

গৌরহরিও তা দেখে হাসলে।

বিনোদিনী বললে, তোমাকে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। মাথায়

মেয়েমানুষের মতো চুল রেখেছ। মুখে বেরিয়েছে পাতলা পাতলা দাড়ি। গায়ে আলখাল্লা। এমন চেহারা আমি তোমার কখনও দেখিনি।

বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

গৌরহরিও হাসলে। বললে, সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি ফিরলাম। পাছে দেরি হলে তুমি একেবারেই না চিনতে পার।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বিনোদিনী বললে, হাঁ, আমার জন্যেই তো তোমার যত ভাবনা! শোনো,—

—বল।

একটু দ্বিধা করে বিনোদিনী বললে, মেঘ খেয়ে রোদ উঠেছে। কাঠফাটা রোদ। এ রোদে তোমাকে ছেড়ে দিতেও মন সরছে না, থাক বলতেও ভয় হচ্ছে।

গৌরহরি হেসে ফেললে। বললে, তা হলে আর কি করা যেতে পারে বল।

বিনোদিনীও হেসে ফেললে। কিন্তু তখনই গম্ভীর হয়ে বললে, হাসি ভালো লাগে না। শোনো, তোমাকে আর পাঁচ বাড়ি যেতে হবে না। আমি যা দিচ্ছি তাই নিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও। এখনও বেলা বেশী হয়নি। নরমে নরমে যেতে পারবে।

—তথাস্তু।

বিনোদিনী ঘরের ভিতর গেল। একটু পরে একখানা ছেঁড়া কাপড়ের কোণে কোণে চাল, ডাল, নুন, আলু, পটল,—প্রায় দুদিনের মতো,—বেঁধে নিয়ে ফিরে এল।

—কই, তোমার ঝুলি পাত।

ঝুলির মধ্যে আলগোছে পুঁটলিটি ফেলে দিলে।

—শুধু তেলটা দিতে পারলে না, না বিনোদিনী?

বিনোদিনী হাসলে।

গৌরহরি আপন মনেই বললে, দুদিনের দিব্যি হবে। তারপরে? তারপরে কি আবার আসব?

—তোমার ইচ্ছে।

—সেই ভালো।

গৌরহরি বাইরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু কি যেন চিন্তা করে থমকে দাঁড়াল। বললে, আচ্ছা তোমাদের এখানে একটা আখড়া তৈরি করার জায়গা পাওয়া যায় না? মনে কর ওই নদীর ধারে খেয়াঘাটের দিকে?

—কি জানি। না, না, এখানে কাজ নেই। আমাদের গাঁয়েই ভালো। বেশ তো জায়গা ছিল। ওইখানেই আগেকার মতো একখানা দুচালা তৈরি কর। আমি বরং কিছু লাগে তো…

—বেশ।

—আমাদের বাড়ির খবর জান? বাবা, মা, দাদা, খোকন সব ভালো আছে?

গৌরহার হাসলে। বললে, তবু ভালো, এতক্ষণে মনে পড়েছে।

বিনোদিনী লজ্জিতভাবে হাসলে। বললে, না, না। অনেকক্ষণ থেকেই জিগ্যেস করব ভাবছিলাম, একথা ওকথায় ভুলে গিয়েছিলাম।

—আর ভুলে গিয়েছিলাম! মেয়েমানুষের মন আমি চিনেছি। শ্বশুরবাড়ি পেলে সব ভুলে যায়।

কোপ কটাক্ষ হেনে বিনোদিনী বললে, যায় তো যায়। তুমি বল সব কেমন আছে?

—ভালোই।

—তোমার সঙ্গে কবে দেখা হয়েছে?

—আজকেও হয়েছে।

—কিছু বলে দেয়নি? তুমি এখানে আসবে জানত?

—আমার তো এখানে আসার ঠিক ছিল না। চলতে চলতে চলে এলাম।

গৌরহরি হাসলে।

পুনরায় বললে, কিছু বলবার থাকে তো বলতে পার।

একটু ভেবে বিনোদিনী বললে, না, বলবার আর কি আছে? জিগ্যেস করলে বোলো ভালোই আছি।

—এই?

—হ্যাঁ। আর শোনো ললিতার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না।

—এর মধ্যে দেখা হবে?

—না হওয়ারই সম্ভাবনা। কেন? কিছু বলবার আছে?

একটু চুপ করে থেকে বিনোদিনী বললে, অনেক দিন দেখিনি, বড় দেখতে ইচ্ছে হয়।

—তাকে খবর দোব? সে সুবিধা আছে।

বিনোদিনী খুশী হয়ে বললে, দিও। অনেকদিন দেখিনি। যেন দু-এক দিন এখানে থাকতে পারে এমন করে আসে। বরং···

বিনোদিনী রসময়কে সুদ্ধ আনার কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। রসময়ের কথা গৌরহরিকে না বলাই ভালো। রাগ তো তার রসময়েরই উপর। নইলে কণ্ঠিবদল ওদের সমাজে এমন কিছু অপরাধের নয়।

বললে, রোদ হচ্ছে। আর তোমাকে আটকাব না।

—আচ্ছা, তা হলে আসি।

—আবার এস।

—আসবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু না এসেও বোধ হয় থাকতে পারব না।

গৌরহরি হেসে চলে গেল। বিনোদিনী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল তার পায়ের শব্দ। শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দূর হতে দূরে। আলের পথের বাঁকে বাঁকে। যেন একতারার গুঞ্জনের আভাস পাওয়া গেল। গৌরহরি মাঠে পড়ে বোধ হয় তার মধুর কণ্ঠে গান ধরেছে। বোধ হয় সেই গানখানি—

তার ভিতরে মায়ানদী
ও সে হেমনদীতে প্রেম ঝরে।

সমস্ত গানখানির মধ্যে এই দুটি লাইনই তার মনে আছে। আর কিছু নেই। এরও সে অর্থ বোঝে না। কোথায় এই মায়ানদী এবং তার ভিতরে কি প্রেম ঝরে এ বোঝার শক্তি বিনোদিনীর নেই। কিন্তু মনে মনে মনগড়া একটা অর্থ করে নিয়েছে। তাতেই মনে পুলক আর ধরে না। শুধু তাও নয়। ভাষা তার কাছে আজ অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। কোনো কথাই যেন তার কানে ঢুকছে না। শুধু সুর। সুরেই তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। গানের কথায় তাকে মনঃসংযোগ করার অবকাশ দিচ্ছে না। আপন মনে গুন গুন করে বিনোদিনী সুর ভাঁজতে লাগল। খুব সন্তর্পণে। কারও কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না।

হাবল চীৎকার করে বললে, মা, ধানে কাক বসেছে যে।

বিনোদিনীর সুর ছিঁড়ে গেল। দুখানা তালাইয়ের উপর গোটা পঞ্চাশেক কাক বসেছে। তারা যত না খাচ্ছে তার চেয়ে বেশী ছড়াচ্ছে। কল কল করছে আরও বেশী। যেন ভোজে বসেছে।

—কো রে, কো রে, কো রে, হুশ্‌!

বিনোদিনী একটা ভাঙা ধনুক উঁচিয়ে তাড়া দিলে। কতকগুলো কাক উড়ে গিয়ে চালে বসল, কতকগুলো পাঁচিলের উপর। আর অত্যন্ত দুঃসাহসী যারা তারা

কাছেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বিনোদিনী তাদের কাছ পর্যন্ত ছুটে গেলে তবে তারা পালাল।

বিনোদিনী ঘুমন্ত অবস্থায় সমুদ্রে পড়েছে। জেগে উঠে আর হাঁফ নেবার সময় পাচ্ছে না। ওদিকে কাকের উপদ্রব। এদিকে গাইগুলো হামলাচ্ছে। দুধ দোয়াবার সময় হল। এখনও বাসিপাটই সব সারা হয়নি। তারপরে স্নান করা, রান্না চাপানো আছে।

বিরক্তভাবে বললে, মিনষে পালের বাড়িতে বসে গল্প গিলছে। গরু ছেড়ে দেবার সময় হল। দুধ দোয়াতে হবে তার খেয়াল নেই। আস্থক একবার বাড়ি। হাবলা, যা তো একবার মিনষেকে মানিকদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয় তো। বলবি···

হাবল গর্জন করে বললে, তুই যা। আমি পারব না।

হাবলের দুরকমের স্বর আছে। যখন তার নিজের গরজ থাকে তখন মিহি খোনা স্বরে কথা বলে। আর যখন তাকে কারও দরকার থাকে তখন গর্জন করে।

বিনোদিনী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তা পারবি কেন? কেমন বাপের ব্যাটা দেখতে হবে! আমার কি! থাক না গরু ঘরে বাঁধা। বাটি ভরে দুধ খাবি তখন।

হাবল এক কথায় সমাধান করে দিলে, দিস না।

বিনোদিনী গজ্ গজ্ করতে লাগল।

একটু পরেই হারাণ এল।

হাসতে হাসতে বললে, রসকেব ছেরাদ্দ বেশ ভালোই লেগে গিয়েছে। লোক গিয়ে-গিয়ে উঠোনে এমন কাদা হয়েছে যেন জাওন শেনেছে।

ভিতর থেকে কোনো সাড়া এল না।

—আর মাগী যেন চিল চেঁচাচ্ছে। বৌটার তো গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিলে! গলা বটে বাবা!

তবু কোনো সাড়া এল না।

—পাঁজিতে না কি লিখেছে শ' আড়া জল। ভট্চায বলছিল, শ'য়ে শুকো। লে বাবা শুকো! আর এক ছাঁট এমনি জল হলে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। হাঃ, হাঃ, হাঃ।

তথাপি নিরুত্তর।

হারাণ বললে, গাইটা দোয়াতে হবে, কেঁড়েটা দে।

এবারে সাড়া এল। বিনোদিনী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, কেঁড়ে আমার মাথায় ফলছে। ন্যাকা! কোথায় কেঁড়ে থাকে জানে না যেন!

হারাণ বুঝলে বিনোদিনী চটেছে। আর বাক্যব্যয় না করে ঘরের ভিতর থেকে কেঁড়েটা নিয়ে গাই দোয়াতে গেল।

ফিরে এসে দুধভরা কেঁড়েটা রান্নাঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে বললে, বুধীটা আজ ভালো দুধ দিলে না কেন? পিইয়ে গেছে না কি? তোকে বলি বাছুরটা সরিয়ে বাঁধবার জন্য। তা আমার কথা তো তোর গেরাহ্যি হয় না।

দুধ কম হওয়ায় হারাণ বিরক্তভাবে দাওয়ার উপর বসল।

এবার বিনোদিনী হেসে ফেললে।

মাথার ঘোমটাটা অজ্ঞাতসারেই একটু টেনে দিয়ে বললে, আহা, পিইয়ে আবার যাবে কেন? পেট দেখে বুঝতে পার না? কানা না কি?

এতক্ষণে হারাণের চোখ ফুটল। ক'দিন থেকে বুধী গাইটার পেটটা পরিপুষ্ট বোধ হচ্ছে বটে। সে কোনোদিন ভালো করে ঠাহর করে দেখেনি। গাইটা দু-বৎসর অন্তর বিয়োয়। এইবারেই তার বিয়োবার বৎসর। বড় ভালো গাই। এখনও যথেষ্ট দুধ দিচ্ছে।

হারাণ অপ্রস্তুতভাবে বললে, তাই হবে। বোধ হয় অঘ্রাণে বিয়োবে। দে দুটো মুড়ি দে। বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে হারাণ গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। বিনোদিনী একটা বড় জামবাটিতে করে একবাটি মুড়ি, তার ধারে দুকুচি শশা, একটা কাঁচা লঙ্কা, একটা বাটিতে এক বাটি গুড় আর এক বাটি দই তার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। একটু পরে একটা ছোট ঘটিতে এক ঘটি জল এনে রাখলে।

হারাণ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মশ্ মশ্ করে কতকগুলো মুড়ি খেয়ে যেন একটু সুস্থ হল।

বললে, এবারে বৃষ্টি এই পর্যন্ত। আর হচ্ছে না।

—তোমার কাছে খবর এসেছে না কি?

হারাণ খুব মাতব্বরের মতো হেসে বললে, খবর আসাই বটে রে পাগলী! কালকে আষাঢ়ের নবমী গেল। বলে,—

যদি বর্ষে ফুনি ফুনি,
বাঁশের ডগায় শোল পৌনি।

যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা,
তবে জানবে বর্ষা গোটা।
যদি বর্ষে মুষলধারে,
মাঝ দরিয়ায় বগা চরে॥

বুঝলি? এবার যে রকম মুষলধারে বৃষ্টি হল তাতে দেখবি মাঝ দরিয়ায় বগা চরবে।

বিনোদিনী ওদিকের বড় ঘরের দাওয়ায় পা মেলা করে তেল মাখতে বসেছে। বিস্মিতভাবে বললে, সে আবার কি?

—সেই তো মজা। দরিয়া মানে বুঝিস না? সমুদ্দুর। মাঝ সমুদ্দুরে চড়া পড়বে। সেইখানে বক চরবে।

—তা হলে জল আর হবে না বল?

—কই আর হবে?

—তা হলেই চিত্তির। 'মাঝ দরিয়ায় বগা চরে'। বাবা! আর একটা কি বললে? 'বাঁশের ডগায়—' কি?

—শোল পৌনি। এত জল হবে যে শোল মাছের পোনা বাঁশের ডগায় উঠবে। হুঁ হুঁ।

পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তেল মালিশ করতে করতে বিনোদিনী বললে, 'বাঁশের ডগায় শোল পৌনি' বাবা, এতও জান তুমি!

পত্নী তার বিদ্যাবত্তার মর্যাদা বুঝেছে দেখে হারাণ গর্বিত হয়ে উঠল। দই দিয়ে মুড়ি মাখিয়ে বেশ মোটা দেখে একটা গ্রাস মুখে তুলে পরম ঔদাসিন্যের সঙ্গে বললে, জানি সবই রে বাপু, কেবল এই ক'টা বছর ভালো ধান না হওয়াতে বোকা হয়ে গেছি।

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস যেন তীর হয়ে এসে বিনোদিনীর বুকে বিঁধল। সে ছেলেপুলের মা। ধান না হওয়ার দুঃখ বোঝে। হারাণের প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভরে উঠল।

বললে, হবে বই কি! এবার হবে। বার বার কি আর ধান না হওয়া হয়? ওসব বগা চরে···

হারাণ ফিকা হেসে বললে, শুধু বগা চরে নয় রে পাগলী। পাঁজিতে আর কি বলেছে জানিস?

বিনোদিনীর তেল মাখা হয়ে গিয়েছিল। কল্‌কে-ঝাড়া তামাকের গুল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে চোখের ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, কি ?

চোখ পাকিয়ে হারাণ বললে, চোৎ মাসে পাঁচ শনিবার গেছে মনে নেই ?

বিনোদিনী আবার ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, তাতে কি ?

—তাতে কি ? তবে আর মুরুক্ষু মেয়েমানুষ বলেছে কেন ? পাঁজিতে লিখছে,

চত্রি মাসে পাঁচ শনি,
লরের মাংস না খায় শুকুনি।

—এমনি মড়ক হবে যে শুকুনিতেও লরমাংস খাবে না। হুঁ হুঁ।

অবস্থা শুনে বিনোদিনীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বললে, তবে কি হবে ! ছেলেগুলোকে নিয়ে···

বিনোদিনীর ভয়-দেখে হারাণের পৌরুষে সুড়সুড়ি লাগল। খুব উৎসাহের সঙ্গে হাপুস হাপুস করে কয়েক গ্রাস মুড়ি মুখে দিয়ে বললে, কাণ্ডর শেষ হবে মোল্লান। দুর্গানাম জপ কর।

মোল্লান কিন্তু ছেলেমেয়ের কথা ভেবে অত সহজে দুর্গানাম জপ করে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। ঘড়া কাঁখে নিয়ে খুব চিন্তিতভাবে স্নানের ঘাটের পথে রওনা হল।

হারাণ বললে, শাক তুলেছিস না কি ?

ওই যা ! শাক তুলতে ভুল হয়ে গেছে। বিনোদিনী ঘড়া নামাবে কি নামাবে না ভাবছে, হারাণ বললে, আচ্ছা যা। আমিই তুলে দোব এখন। সেই সঙ্গে শাকের খেতে দুঘড়া জলও দিয়ে দোব। আর কি বললি ? আমড়া আর ডুমুর।

হারাণের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডান হাতের করতল এবং আঙুলের ডগা পরিতৃপ্তির সঙ্গে চাটতে চাটতে বললে, তাও তুলে দোব। আর মাছ তো পেলাম না। ডোবাটায় ঘাটজালখানা ফেলব না কি ?

বিনোদিনী মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, আর ঘাটজালে মাছ ধরতে হবে না। অমনি করে মাছ ধরে ভুট্টি নাশ করলে। এর পর হঠাৎ একদিন কুটুম-সাক্ষাৎ এলে আর মাছ পাওয়া যাবে না।

এর উপর আর হারাণ দ্বিরুক্তি করতে সাহস করলে না। বিনোদিনী স্নান করতে গেল। আর হারাণ গেল শাক তুলতে। আঙলে করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শাকের পাতা তুলে একটা ডালায় বোঝাই করলে।

রাখাল এল।

—গাই দোয়ান হয়েছে গো ?, গরু ছেড়ে দোব ?

—দে। এতক্ষণ কি করছিলি ?

—জল খাব না ?

হারাণ মুখ বেঁকিয়ে বললে, ওঃ! বেটা আমার বাবুর বেটা গাড়োয়ান! জল খেতে দুপুর গড়ায়! তারপর কুসমীতলার পাড়ে দুচক্কর ঘুরিয়ে গরুগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসবি। কেন, বিলে যেতে পারিস না ?

ঠিকে রাখাল। শুধু দশটার সময় গরুগুলো একবার চরাতে নিয়ে যায়, একটা-দেড়টার সময় আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মাসে দুআনা মাইনে পায়। এমনি অনেকের গরুই চরায়। সুতরাং ইংরিজিতে যাকে বলে free lance.

সেও মুখ বেঁকিয়ে বললে, একা যাব নাকি গো ?

কেন, সবাই তো যায়!

—কেউ যায় না।

রাখাল গরু নিয়ে চলে গেল। হারাণ দুহাতে দুটো মাটির ঘড়া নিয়ে শাকের খেতে দেবার জল তুলতে লাগল। ঘড়া দুটোর মুখে আড়াআড়িভাবে একটা করে শক্ত কাঠি খড়ের দড়ি দিয়ে বেশ করে বাঁধা। সেই কাঠিটা ধরে জল আনার বেশ সুবিধা হয়।

বার কতক জল তোলার পর হারাণ বড় ঘরের দাওয়ায় ক্লান্তভাবে বসে কল্‌কেতে তামাক সাজতে লাগল। চকমকি ঠুকে শোলায় আগুন ফেললে। একটা খড়ের নুটি পাকিয়ে তাই জ্বালিয়ে কল্‌কের উপর রাখলে। তারপর হুঁকোটা নিয়ে এসে দুটো টান দিয়েছে এমন সময় সদানন্দ মোড়ল এল।

সদানন্দ কিছুকাল আগে মণ্ডলই ছিল। সম্প্রতি তার ছেলে তারাপদ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবার পর দাস হয়েছে। গ্রামের লোকে মোড়লই এখনও বলে, কিন্তু সে নিজে বলে ছিরি সদানন্দ দাস। সদানন্দ হারাণের চেয়ে সামান্য কিছু বড়ই হবে। গ্রাম সম্পর্কে কাকাও হয়। কিন্তু তামাক খাওয়া সম্বন্ধে এদের মধ্যে ছোট বড় মানামানি নেই।

সদানন্দ দাওয়ায় উঠে একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে বসল। বললে, বিষ্টি তো মন্দ হল না। এমনি সম্বচ্ছর হয় তবে তো। নইলে আবার যে-কে-সে।

হুঁকোর জন্যে সদানন্দ হাত বাড়ালে।

তার হাতে হুঁকোটা দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হারাণ বললে, হবে! ওই আনন্দেই থাক। আষাঢ়ে নবমীর বিষ্টির ঘটা দেখেও কি বুঝলে না কি হবে ?

সদানন্দর তখন উত্তর দেবার শক্তি ছিল না। একটি মুখ ধোঁয়া সে কোঁৎ করে পেটের মধ্যে গিলে আকাশের দিকে মুখ করেছে। একটু একটু করে টিপে টিপে ধোঁয়া ছেড়ে বাদশাই গলায় উত্তর দিলে, আহা, পুষ্কর মেঘ যে!

হারাণ হাঁটুতে চাপড় মেরে বললে, তাতে কি হয়েছে! পাঁজিতে লেখা আছে, এবারে শ' আড়া জল। জান না, শ'য়ে শুকো। তার পরে চোৎ মাসে পাঁচ শনি। এবারে আর…

সদানন্দ হা হা করে মুরুব্বির মতো হেসে বললে, অন্য দেশে তাই বটে। এ দেশে নয়।

—কেন?

—বাঁধা।—বলে গম্ভীরভাবে সদানন্দ হুঁকোয় টান দিলে।

হারাণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, বাঁধা কি?

—পুষ্কর মেঘ। বলে, পুষ্করে দুষ্কর বারি। বটে। অন্য দেশে তাই বটে। কিন্তু আমাদের এ দেশে নয়! এ দেশে পুষ্কর বাঁধা। এতটা বয়স হল তাও জান না?

হারাণ মুখ কাঁচুমাচু করলে। ভাগ্যে এ সময় বিনোদিনী নেই। তার সব বিদ্যেই ফাঁস হয়েছিল তা হলে! ভগবান খুব মুখ রক্ষা করেছেন!

বললে, জানি না তো। বাঁধা কি রকম?

সদানন্দ হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে ভালো করে বসল। সেও বোধ হয় এখনই গাই দুইয়ে আসছে। কোমরে গামছাটা বাঁধা। গামছা খুলে মুখের, কপালের ঘাম মুছে বললে—

শোনো বলি। শাওন মাস। তবু কাঠফাটা রোদ। সেবারে আর এক ফোঁটা জলও কোথাও হয়নি। জমি ফাটছে, পুকুর ফাটছে, নদী নালা সব বালি ধু ধু করছে। গাছের পাতা পর্যন্ত রোদে ঝলসে শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। দেশ-বিদেশে সব হাহাকার উঠেছে। সব গেল। ছিষ্টি আর থাকে না। এক মোড়ল, দুঃখ-ধান্ধা করে খায়, আর ভগবানকে ডাকে। হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে এক বামুন এসে হাজির। কালো মিশমিশে রঙ আর পাখোয়াজের আওয়াজের মতো গলা। এসে বললে, বাপু আমাকে একটা ঘর দিতে হবে, সেই ঘরে বসে তপিস্তে করব। তোমাদের কিছু আমি খাব না, কিছু না শুধু থাকব। কিন্তু পয়লা বোশেখের আগে আমাকে কেউ ডাকতে পাবে না।

মোড়লের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল। আর দেখলে, বামুন যখন না খেয়ে এতটা

কাল ওপিস্যে করবে তখন ও সামান্যি নয়। হাত জোড় করে বললে, তাই হবে। কিন্তু না খেয়ে থাকলে আমার যে অকল্যেণ হবে!

বামুন বললে, কিছু হবে না। আমার আশীর্বাদে তোমার ভালোই হবে।

মোড়ল আর কিছু বললে না।

বামুন থাকে, থাকে। একমাস গেল। জল আর হয় না। গরুর বাঁটে দুধ ছিল তাও শুকোল। কারও একদিন এক সন্ধ্যে চলে, কারও তাও চলে না। না খেয়ে কত লোক যে ম'ল—তার আর লেখা-জোখা নেই। যারা বেঁচে রইল তাদেরও অস্থিচর্মসার হল। আর মানুষের, আর কুকুর-বেড়াল-গরু-ছাগলের মরার গন্ধে গাঁয়ে টেকা দায় হল। যেখানে মরে সেইখানে পড়ে থাকে। কে ফেলে দেবে? শরীরে কি কারও কিছু আছে! এমনি করে একটি মাস গেল।

মোড়লেরও ঘরে একদিন কিছু নেই। সকাল থেকে ভাবছে কি হবে। কি করে ছেলেমেয়ের মুখে দুটো ভাত দেবে। ভাবে, আর চারদিকে খোঁজে, যদি কিছু পাওয়া যায়। ভগবানের দয়া, সিন্দূর কৌটোটা খুলতেই দেখে একটা নাকচাবি। মোল্লান তার ছেলের অসুখের সময় ওইটুকু মা দুর্গার মানত করে ছেলের কপালে ঠেকিয়ে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল, পাছে মোড়লের চোখে পড়ে। মানত! আপনি বাঁচলে বাপের নাম। মোড়ল তো সেইটুকু মহাজনের কাছে বিক্রি করে চাল ডাল কিনে নিয়ে এল। মোল্লান রান্না চড়াল। পাতার জ্বালে রান্না। হঠাৎ কি করে রান্নাঘরের চালে লাগল আগুন। আর এক ফোঁটা বিষ্টি নেই, চাল তো তেতে বারুদ হয়েই আছে। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই যে আগুন নিবোবে।

মোড়ল হাহাকার করে উঠল।

বহু লোক এসে জুটল। আগুনের হাত থেকে রক্ষে কোনো দিকেই নেই। সবাই বললে, ও রান্নাঘরটা তো গেছেই, এখন বাকি ঘর কি করে বাঁচে সেই সমিস্যে। বাসন-কোসন, বিছানা-বালিশ যা কিছু আছে তাই আগে রক্ষে কর। বলে কিন্তু আর কেউ দাঁড়াল না। সবাই নিজের নিজের ঘর বাঁচাতে ছুটল। এ আগুনে গাঁ কি আর বাঁচবে!

মোড়ল আর মোল্লান তো ঘরের ভেতরকার জিনিস টেনে হিঁচড়ে উঠোনে এনে ফেলতে লাগল। একটা ঘরের জিনিস বার করে আর একটা ঘর ঠেলতে গিয়ে দেখে ঘর ভিতর থেকে বন্ধ।

তাই তো!

সেই বামুন যে ওঘরে তপিস্যে করছে সে কথা তো কারও মনেই নেই! ডাক, ডাক!

—ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!

অনেকক্ষণ পরে সাড়া এল, কে।

—শীগ্‌গীর দরজা খুলুন!

—কেন?

—ঘরে আগুন লেগেছে, শীগ্‌গীর বেরিয়ে আস্থন।

বামুন তো উঠল, উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে একটু হাসল।

হারাণ তখন তামাক খাওয়া ভুলে গেছে। সে হাঁ করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। অপরিচিত এবং বহুকাল পূর্বের সেই মোড়লের দুঃখে তার চিত্ত বিগলিত হয়েছে। এই তপস্যানিরত ব্রাহ্মণ যদি কোনোক্রমে তাকে বাঁচাতে পারেন সে আশ্বস্ত হয়।

সদানন্দ দুটি চক্ষু আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বুলিয়ে বলতে লাগল:

তামার টাটের মতো আকাশ, কোথাও কিচ্ছু নেই, হঠাৎ মেঘে কালো হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে নামল বৃষ্টি। ঝমাঝম, ঝমাঝম, তার আর বিরাম নেই। দুদিন দুরাত দেবতা সমানে ঢাললেন। আগুন তো আগুন, পুকুর গড় মাঠ বিল সব জলে ভাসতে লাগল। সেই যে বৃষ্টি নামল, তার পরে সমানে বৃষ্টি হতে লাগল। আর সেবারে চাষে যে ফসল উঠল তেমন ফসল লোকে জীবনে কখনও দেখেনি।

সদানন্দ চোখ পাকিয়ে হারাণের দিকে চেয়ে রইল।

হারাণ তখন বিস্ময়ে বাক্‌শক্তিহীন। কোনো রকমে জিজ্ঞাসা করলে, বামুন?

—সেই তো পুষ্কর মেঘ।

সদানন্দ দুহাত পুষ্কর মেঘের উদ্দেশে কপালে ঠেকাল। দেখাদেখি হারাণও।

সদানন্দ বলতে লাগল:

বামুন হেসে বললে, বাবা, কাণ্ড দেখে অবাক হয়ো না। আমিই পুষ্কর মেঘ। এবার আমার রাজত্বি। কিন্তু বৃষ্টি দেবার তো উপায় নেই। তাই তোমার ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম, কোনোরকমে এক ঘুমে বছরটা এইখানে শেষ করে পিটটান দোব। তা তুমি আর হতে দিলে না। ঘর থেকে আমাকে বার করলে। তা যাই হোক, ভালোই হল। আবার যদি আমি কখনও আসি আর সব জায়গায় বৃষ্টি না হলেও তোমাদের এ দেশে জল দোব। সেই থেকে আমাদের এ দেশে পুষ্কর বাঁধা। কোথাও যদি বৃষ্টি না হয় এখানে হবেই।

সদানন্দ হুঁকোটা হারাণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টানতে লাগল।

হারাণ জিজ্ঞাসা করলে, সে কোথাকার মোড়ল বটে?

—এখানকারই।

—আমাদের গাঁয়ের?

সদানন্দ ডুমুর গাছে কি যেন অন্বেষণ করতে করতে উত্তর দিলে, তা জানি না। হবে এদিকেরই কোথাওকার। তোমার ডুমুর তো ভালো হয়েছে হে!

হারাণ বললে, পাড়োনা গোটাকতক। তোমারও হবে, আমারও হবে। আমি বরং গোটাকতক আমড়া দেখিগে, কি বল?

সদানন্দ খুশী হয়ে ডুমুর পাড়তে গেল। ঘরে তার আজ তরকারি বলতে কিছু নেই। ডুমুরের জন্যেই এখানে তার আসা। পুষ্কর মেঘের উপাখ্যান শোনাতে নয়।

আর হারাণ আমড়া পাড়তে পাড়তে ভাবতে লাগল, সে যদি সেই মোড়ল হত! আর তার কাছে পুষ্কর যদি আতিথ্য নিত! কিছু নয়, একবার তাঁর রূপটা চোখে দেখে নিত। দেখে নিত মেঘের দেবতার রূপ কেমন হয়।

দুই

বেলা দশটা বাজেনি তখনও। কিন্তু এরই মধ্যে এমন চিড়বিড়ে রোদ উঠেছে যে উঠোনে এক মিনিট দাঁড়াবার উপায় নেই। আর তেমনি গুমোট। কলকল ধারে ঘাম হচ্ছে। ঘেঁটুবন থেকে একরকম উগ্র কটু গন্ধ বার হচ্ছে। সেখানে আর বেড়ার বাঘ-ভেরেণ্ডা গাছে গাছে অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন তুলেছে। পানাপুকুরে কচুরীপানায় বেগুনী রঙের হাজার হাজার ফুল ফুটেছে, ভ্রমরের দল সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। কোথায় নয়? বাঁশের খুঁটিগুলো পর্যন্ত ছিদ্র করে করে অন্তঃসারশূন্য করে ছেড়েছে।

খামারের ধারে ধারে যে কঞ্চির বেড়া সেখানে জুটেছে অসংখ্য বিচিত্র বর্ণের ফড়িং—আর রঙ-বেরঙের প্রজাপতি। তারই লোভে বহু ছেলের ভিড় হয়েছে সেইখানে। অতি সন্তর্পণে চোরের মতো এসে তারা ফড়িং ধরবার চেষ্টা করছে। প্রজাপতির নরম দেহ। মনে হয় আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই তার রেণুর মতো পাখা ঝুর ঝুর করে ঝরে যাবে। প্রজাপতির সম্বন্ধে শিশুমনের একটা দরদ আছে। তাকে ধরার লোভ আছে, কিন্তু ইচ্ছে নেই। ছোট মেয়েরা ব্যস্ত কাঁচপোকা ধরতে। কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে কাঁচপোকা ধরছে। টিপ পরবে। কাপড়ের ভিতরে কাঁচপোকার আর্তনাদ কানে লাগিয়ে শুনছে। বড় মজা লাগছে। বলছে কলের গান হচ্ছে। আর ভাঙছে কুমরে পোকার ঘর। মাখনের মতো কোমল মসৃণ মাটি দিয়ে গড়া ছোট ছোট বাসা। ভাঙছে অকারণে। নিছক শিশুসুলভ কৌতূহলের বশে। মাটি যে অমন মসৃণ হয় তাই দেখতে আমোদ লাগছে।

বাঁশের বনে 'গাধার টুপি'র মতো অজস্র নতুন কোঁড়া জন্মেছে। তার গায়ে চুলের মতো শুঁয়ো। সেখানে হাত দিতে গিয়ে ছেলেরা জব্দ হচ্ছে। কুটকুটিতে সারা। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে মায়ের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে। কাজে ব্যস্ত মা। ছেলেকে পঞ্চ মুখে গাল পাড়ছে, আর তেল বুলিয়ে যন্ত্রণার উপশম করছে। কিন্তু যন্ত্রণা ভুলতে ছেলের এক মিনিটও লাগছে না। পরের মুহূর্তে আবার তাকে দেখা যাচ্ছে বাঁশের ঝাড়ের নীচে নীচে ঘুরে বেড়াতে, নয়তো আতা গাছে যেখানে ফুলের মতো কচি কচি ফল ধরেছে, এখনও দানা বাঁধেনি, তাই তুলতে।

কিন্তু সদানন্দের পুষ্কর মেঘের উপাখ্যান বুঝি মিথ্যে হয়। সেই-যে আষাঢ়ে

নবমীর ঝড়বৃষ্টি, তারপরে আর একটি ফোঁটা পড়েনি। লাঙলের চাষ অবশ্য সারা হয়েছে। ধুলোটের বীজ এখনও অবশ্য লক লক করছে। কিন্তু আর বুঝি থাকে না। আর দিনকতক এমনি শুকো গেলে সমস্ত বীজ শুকিয়ে খড় হয়ে যাবে। তখন আর দেশে বীজ মিলবে না।

ছেলেরা অত বোঝে না। তারা সকালবেলায় কাক ডাকতে না ডাকতে একটি পেট মুড়ি বসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঁশবনের নীচে নীচে, নয়তো আতাবনের ঝোপে ঝোপে। কিন্তু বাপের দুঃখ মেয়েরা বুঝেছে। মহাসমারোহে তারা ব্যাঙের বিয়ে লাগিয়েছে। ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়, এতে নাকি আর ভুল নেই।

নবদ্বীপ মণ্ডলের নবমবর্ষীয়া কন্যা ক্ষান্তমণি, সেই হয়েছে মেয়ের মা। আর বৃন্দাবন ঘোষের মেয়ে জয়াবতী ছেলের মা। এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। ধুম ক্ষান্তরই বেশী। পাড়ার সমস্ত মেয়ে এসে খাটছে। কারও আর বিশ্রামের অবকাশ নেই। আগের দিন পাড়ায় বাড়ি বাড়ি চাল সেধে বেড়িয়েছে। আধ সের করে চাল আর একটি করে পয়সা। দিতে কেউ কৃপণতা করেনি। ব্যাঙের বিয়ে বড় যে-সে কথা নয়। তারই উপর নির্ভর করছে এবারের বর্ষা, এবারের ফসল। কেনই বা না নেবে? বুড়োরা পর্যন্ত এসে মাঝে মাঝে তাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। আর বুড়ীরা শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কিসের পর কি করতে হয়। কিন্তু তার দরকার ছিল না। ক্ষান্ত পাকা মেয়ে। এই বয়সেই সে যে কত মেয়ে পার করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সে কথা, গম্ভীর চিন্তিত মুখে ব্যস্তভাবে যেমন করে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। সে দশবার ঘর-বার করছে, একে ওকে মাঝে মাঝে খোশামোদির সঙ্গে নানানতর উপদেশ দিচ্ছে, আর যে আসছে তাকেই ধরে ধরে বলছে, কি করে যে এই মেয়েটিকে পার করব জানি না বাছা। এ আমার এক যন্ত্রণা হয়েছে!

মেয়ে তখন একটি কাঠের কৌটোর মধ্যে কি ভাবছে ভগবান জানেন। হয়তো মুক্তির কোনো উপায় আছে কি না তাই ভাবছে। কিন্তু সে পথ তার মানবী মা বন্ধ করে রেখেছে। কৌটোর মুখ একখানা পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা।

বিপদ করছে ছেলেরা। তারা মাঝে মাঝে ছোটখাটো ডাকাতের দলের মতো এসে দক্ষযজ্ঞ বাধাবার চেষ্টায় আছে। এক একবার তারা আসছে, আর কর্মবাড়িতে কোলাহল পড়ে যাচ্ছে। ছোট মেয়েরা চ্যাঁচাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চেয়ে বড় ভীরু মেয়েরাও চীৎকার করছে। যারা সাহসী, তারাও চ্যাঁচাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাতা-বেড়ি-খুন্তি নিয়ে যুদ্ধ দেবার জন্যে পাঁয়তারাও ভাঁজছে। ক্ষান্ত এসে তাদের

হাতে এটা-ওটা দিয়ে ক্ষান্ত করছে। তারা যেন বর্গীর দল। কিছু পাওয়া মাত্র আর দাঁড়াচ্ছে না। নিজের নিজের আড্ডায় প্রস্থান করছে।

খুব ধুমধামে তেল-হলুদ হল। পয়সা আর চাল যা পেয়েছিল তার কিছু দিয়ে একদল মুচির বাজনার বায়না দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে তারা দুবার এসে খুব খানিক বাজিয়ে গেছে। বাজনা শুনে ফড়িংধরা ফেলে ছেলেরা সুদ্ধ এসে জুটেছিল। তারা যত না তেল-হলুদ মাখলে তার চেয়ে বেশী মাখলে কাদা। মেয়েরা তখন সরে দাঁড়িয়েছে। তারা কেবল পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে উঠোনে ঢালছে। আর ছেলেরা এ ওর পা টেনে দুম্ করে ফেলছে আর কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এই কৌতুকে কেউ কেউ যে আহত না হচ্ছিল তাও নয়। তাদের মধ্যে যারা একটু বলিষ্ঠ, তারা আঘাতকে গ্রাহ্য না করেই খেলায় মাতছিল। যারা দুর্বল, তারা কাঁদতে কাঁদতে আর গাল দিতে দিতে বাড়ি পালাচ্ছিল। এমনি চলল এক ঘণ্টা কাল। তারপরে কাপড়ে-চোপড়ে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ছেলেদের এমন চেহারা হল যে, কোন্‌টা কে, বিশেষ লক্ষ্য করে না দেখলে, চেনবার কোনো উপায়ই রইল না।

কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। কাদা-মহোৎসব সেরে তারা কেউ মাথায় কলকে ফুলের মালা জড়িয়ে, কেউ একটা করবীর ডাল, কেউ বা নিমের ডাল নিয়ে নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে চলল :

কলকে ফুলের মালা তোর গলায় দোব,
ওরে মালা, হায়রে মালা, ওরে মালা রে,
মালা তোর গলায় দোব।

আর পিছনে মেয়েরা সুর করে বলতে বলতে চলল :

হিস্পোলা পোলা ব্যাঙের বিয়ে দোব,
বেয়ানের বাড়ি যাব,
বেয়ান মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি,
আর যাব না বেয়ানের বাড়ি।
বেয়ানের অলিগলি,
বেয়ানের ফুটো ঘর,
জল পড়ে টপাটপ্॥

তারপরে স্নান। কিন্তু স্নানে সুখ নেই। পুকুরের জল একেবারে তলায়

ঠেকেছে। ওরই মধ্যে যতখানি পারলে জলে-কাদায় এক করলে। করে উঠে এল। বেশী দেরি করারও উপায় নেই। আজ গায়ে-হলুদ, আজই বিয়ে। তারপরে পাঁচখানা পাতা ওঠানো আছে। বেশী কিছু হবে না—খিচুড়ি, শাক, আলু, কচু ভাজা আর পায়েস। ক্ষান্ত তার যোগাড় করবার জন্যে বড় মেয়েদের হাতে-পায়ে ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেল। ছোট মেয়েরা রইল। কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্যে নয়। ওদিকে বিয়ের এবং খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে দেখবার জন্যে তারাও উঠে চলে গেল। ছেলেরাও আরও একটু মাতামাতি করে অবশেষে উঠে পড়ল। বিয়ের সম্বন্ধে তাদের অবশ্য কোনো কৌতূহল নেই। ভোজনেরও নিমন্ত্রণ নেই। তবু যদি হাঙ্গাম-হুজ্জৎ পাকিয়ে কিছু পাওয়া যায়।

বিয়ের বেশী হাঙ্গাম নেই। ওরাই নাপিত, ওরাই পুরুত। মন্ত্রও খুব সংক্ষিপ্ত। মুচিরা এসে খুব ধুমধাম করে বাজনা বাজাতে লেগে গেল। মেয়ের মা মন্ত্র পড়লে :

ব্যাঙ লো রানী,
দে দো পানি।
হে মথুরেশ, জল দাও,
হে বৃন্দা, জল দাও,
হে বরুণ, জল দাও ॥

অমনি সবাই সমস্বরে গাইতে লাগল :

ব্যাঙ লো রানী,
দে দো পানি।

তারপর একটা রঙচঙে টিনের পালকিতে বর-বউ চড়িয়ে ছাদনাতলায় সাত পাক ঘোরানো হল। শাঁখ বাজল, হুলুধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। সঙ্গে সঙ্গে ঢোলের বাজনা।

বিয়ে শেষ হবার পরে সব খেতে বসল। রান্নাটা অবশ্য ওদের আর রাঁধতে দেওয়া হয়নি। রেঁধেছিল ক্ষান্তর পদ্মপিসি। কলাবন থেকে সবাই কলাপাতা কেটে আনলে। বাড়ি থেকে আনল কাঁসার গ্লাস। আর সঙ্গে সঙ্গে এল প্রত্যেকের ছোট্ট ছোট্ট দু-একটি ভাই-বোন। পদ্মপিসি রাঁধে ভালো। মসলার মধ্যে খানিকটা হলুদ। তাইতেই রান্না যেন অমৃতের মতো হয়েছিল। কিছু ব্যয় অবশ্য পিসিরও হল। বরাদ্দ রান্নার উপরও পিসি নিজের ঘর থেকে খানিকটা কুমড়ো এনেছিল। কচু তো ছিলই। কচুতে কুমড়োতে একটা তরকারি হয়েছিল।

তার স্বাদই আলাদা। মেয়েরা তো বার বার চেয়ে খেতে লাগল। তেমনি চমৎকার হয়েছিল পায়েস। এ গ্রামে দুধের অভাব নেই। ঘরে ঘরে বহু গাই গরু। মেয়েরা প্রত্যেক বাড়ি থেকে সেধে যে পরিমাণ দুধ পেয়েছিল তা যথেষ্ট। পদ্মপিসির ঘরে কিছু সরু চাল ছিল। তাই দিয়ে যে পায়েস হল তার স্বাদ মুখে লেগে থাকে। মেয়েরা সব এমন করে খেলে যে আর উঠতে পারে না। যা খেতে পারলে না, তা ঘটিতে করে নিয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে রাত্রে খাবে।

পদ্মপিসির ওইতেই আনন্দ। বিধবা মানুষ। না পেটের একটা ছেলে আছে, না কিছু। আবার এমন সংস্থানও নেই যে পাল-পর্ব উপলক্ষে দুটো ছেলেমেয়েকে ডেকে খাওয়ায়। কাজেই এমনি ভাবেই মনের সাধ মেটায়। ছেলেমেয়েরা কোনো কিছু করলে সে তাদের বাঁধা রাঁধুনী। তারা যা আয়োজন করে তা করে, তার সঙ্গে নিজেও ঘর থেকে সামান্য কিছু দিয়ে সাধ মিটিয়ে খাওয়ায়। সাধ কি আর মেটে! তবু ওই যেটুকু মেটে তাই লাভ। ওর বেশী সাধ মেটাবার তার সাধ্যও নেই। আবার লোকের বাড়ি কাজেকর্মে যায়। রাঁধেবাড়ে। পাঁচজনকে দরকার হলে পরিবেশনও করে। লোকে রান্নার সুখ্যাতি করলে আনন্দে চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি মুখ লুকোয়। পাঁচজনে তাকে সাধ্যসাধনা করে সমাদরে ডাকেও। ভালো রান্নার জন্যে তো বটেই, তা ছাড়া এতটুকু লোভ নেই। খেতে দিলে খায়, না দিলেও চায় না। বলে, খুব খেয়েছি। না খেয়ে অত খাটতে মানুষে পারে না। তার উপর, ছেলেপুলে তো নেই, কাজের বাড়ি থেকে কিছু বেঁধে নিয়ে যাবার আগ্রহও সেজন্যে নেই। আর নিজে খায়ও অতি সামান্য। তার হাতে রান্নার ভার ছেড়ে দিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত হয়।

ছেলেরা ভেবেছিল, কাড়াকাড়ি করে মেয়েদের কাছ থেকে কিছু ভাগ বসাবে। কিন্তু পদ্মপিসিকে রান্না করতে দেখে তারা হতাশ হয়ে গেল। পদ্মপিসি এমনিতে বেশী কথা বলে না বটে, কিন্তু যখন বলে তখন আর বাকি কিছু রাখে না। তাকে ভয় করে না, এ গ্রামে এমন পুরুষ মানুষ নেই। ছেলেরা বাইরে থেকে উঁকি দিয়েই পালাচ্ছিল। কিন্তু পিসি তাদের ডেকে বসালে। কিছু কলাপাতা বেঁচেছিল। তাই একটু একটু ছিঁড়ে সবারই হাতে হাতে দিয়ে উঠোনে বসালে। সবই কিছু কিছু বেঁচেছিল। তাদের পাতে সব জিনিসই পিসি একটু একটু দিলে। একটু খিচুড়ি, একটু তরকারি, একটু ভাজা আর একটু পায়েস। ছেলেরাও সব বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে। বেলা তো কম হয়নি। তিনটে বাজে। তাদেরও জঠরের তেমন দাবি ছিল না। ওই খেয়েই আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠল।

তিনটে বাজে, পাঁচটায় বিয়ে বেরুবে গ্রাম ঘুরতে। তার সাজপোশাক করা আছে।

সাজ-পোশাক বিশেষ কিছু না হলেও ওরই মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সবাই রঙীন শাড়ী পেশোয়াজের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরেছে। যার অন্য রঙীন শাড়ী নেই, সে শিউলি ফুলে ছোপানো বাসন্তী রঙের সাধারণ শাড়ীও পরেছে। তার উপর গায়ে দিয়েছে বড় বড় লেসওয়ালা বডিস। কেউ তার নিজের বডিস, কেউ-বা তার বিবাহিতা দিদির।

এমনি পোশাক পরে নাচতে নাচতে তারা বিয়ে বার করলে। একটি টিনের পালকির মধ্যে দুটি ফুলে ঢাকা কৌটোর মধ্যে বর আর বউ। আগে বাজনা, তার পিছনে নাচতে নাচতে চলেছে মেয়েরা। মোহন ছেলেটি বড় ভালো। বারো মাস ম্যালেরিয়ায় ভোগে। ফলে সে যে পরিমাণে দুর্বল হয়েছে সেই পরিমাণে লোভীও হয়েছে। মেয়েরা তাকে ভয় করে না। বরং সামান্য একখানা পাটালির লোভ দেখিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়। সে চলেছে মেয়েদের সঙ্গে। এক হাতে তার কোলসরা, এক হাতে দান-সামগ্রী। গুরু ভোজনের পরে এই ক'টি জিনিস বয়ে নিয়ে যেতেই তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

যেখানে যেখানে দু-চার জন লোক দেখে, সেখানেই তারা একবার দাঁড়ায়। ঘুরে ঘুরে নাচে। কৌতূহলী মেয়েরা দান-সামগ্রী উলটে পালটে নেড়ে চেড়ে দেখে। কেউ বলে বেশ, কেউ বলে আহা! সবাই হাসে। মেয়েদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। গত বৎসর বারোয়ারির সময় বড় দলের যে যাত্রা এসেছিল তাদের কাছে যে যত রকমের নাচ দেখেছে, সে তত রকমের নাচ দেখাতে লাগল। কোমর ঘুরিয়ে, বোঁ বোঁ করে পাক খেয়ে চিবুকে হাত দিয়ে আরও বহু রকমের নাচ।

এই সব বহু রকমের নাচ দেখিয়ে গ্রাম ঘুরে যখন তারা ফিরল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই রাত্রেই বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। এক রাত্রের বৃষ্টিতে মাঠ ভাসতে লাগল। গ্রামের এবং মাঠের পুকুরগুলোয় অনেকখানি করে জলও দাঁড়াল। গ্রামের কারও মনে সন্দেহমাত্র রইল না যে, এ বৃষ্টি ব্যাঙের বিয়ের কল্যাণে। তাদের প্রতি সদয় হয়ে ব্যাঙরানী, মথুরেশ, বৃন্দা এবং বরুণদেব জল দিয়েছেন।

এ বৃষ্টিতেও গ্রামের অনেক ক্ষতি হল। অনেক ঘরের চাল উড়ে গেল, অনেক

বাড়ি পড়ল (এমনকি জটে বুড়ীর বাড়িও), অনেক গাছের ডাল ভাঙল, গ্রামের পথ ঘাট উঠোন জলে থৈ থৈ করতে লাগল। আর ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত ঠায় বৃষ্টিতে এ-কোণ ও-কোণ করা, সে তো আছেই। কিন্তু কে সে সব ভ্রূক্ষেপ করে! রাত যেন আর পোহায় না! ভোর হতে না হতেই চাষীরা সব মাঠে বেরিয়ে পড়ল। যে মাঠ এতদিন বৃষ্টির অভাবে খাঁ খাঁ করছিল, এক পশলা সুবৃষ্টি পেয়ে সে মাঠ যেন আনন্দে ঢেউএ ঢেউএ নাচতে লাগল। বহু মানুষের উল্লসিত কণ্ঠস্বরে মাঠ যেন গান গেয়ে উঠল।

স্ফূর্তি বেশী হয়েছে ছেলেদের। বড়রা সব মাঠে। তাদের শাসন করতে কেউ নেই। একবার সেই দশটার সময় মাঠে জল খাবার নিয়ে যেতে হবে। তার এখনও অনেক দেরি। ইতিমধ্যে গাছে গাছে, ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে তারা একেবারে মাতামাতি করে বেড়াতে লাগল। তাদের উৎপাতে গ্রামের মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একটি ভিখারিনী আসছিল ভিক্ষা করতে। ভিন্‌গাঁয়ে বাড়ি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার কাঁচা-পাকা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ে একটা লম্বা আলখাল্লা। তার উপরে থান ধুতি। হাতে ভিক্ষা পাত্র। মুখখানি বহু রেখায় বিকৃত। সম্মুখের বড় বড় দুটি দাঁত একটু বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

তারই পিছনে ছেলেরা লাগল।

বুড়ী একটি বাড়িতে ঢুকেছে ভিক্ষার জন্যে, অমনি কয়েকটি ছেলে বাইরের দুয়ারে একটা ছোট মই আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখে আড়ালে লুকিয়ে রইল। মেয়েটি ভিক্ষা সেরে বেরিয়ে আসবার সময় মইএর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। বুঝলে এ কাজের যারা কাজী তারা বাইরেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

সকাতরে তাদের উদ্দেশে বললে, নাও বাবা, মইটা তুলে নাও।

কোনো উত্তর নেই।

—তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা, তুলে নাও।

উত্তর নেই।

অবশেষে বার কয়েক এমনি অনুনয় করতে একটি বড় মতন ছেলে পাঁচিলের আড়াল থেকে সামনে এল।

হাত দিয়ে ঠোঁট থেকে হাসিটুকু মুছে নিয়ে বললে, তুমি ওইটুকু ডিঙিয়েই এস না বাছা।

—না বাবা, তুলে নাও।

—ও কার না কার মই, আমি ছুঁতে পারব না। তুমি ডিঙিয়ে আসতে পার না?

বুড়ী হাত জোড় করে বললে, হেই বাবা, আমি বুড়ো মানুষ। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব।

ছেলেটিও তুলে দেবে না, বুড়ীও ছাড়বে না। অবশেষে হাসতে হাসতে ছেলেটি মইখানি তুলে নিলে। বুড়ী হাঁফ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল। ছেলেগুলো তখন তার পিছনে লেগেছে—কুক্ কুক্ কুক্।

বুড়ী রেগে কাঁই। মুখে যা আসে তাই বলে গাল দেয়।

ছেলেরা হাসে। আর বলে, কুক্ কুক্ কুক্।

বুড়ী যেখানে যায় ছেলেরা তার পিছু পিছু যায়। হাততালি দেয়। আর বলে, ডাইনী বুড়ী, ডাইনী বুড়ী।

বুড়ীর আর ভিক্ষা করা হল না। সে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে মাঠের পথ ধরলে।

ব্যাপারটি অবশ্য ছেলেদের আবিষ্কার নয়। এই বুড়ী সম্বন্ধে এ গ্রামে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। এ বুড়ী না কি ডাইনী। মুখে একটা খড় লাগিয়ে ছোট ছেলে স্পর্শমাত্র না করে তার রক্ত নিঃশেষে চুষে নিতে পারে। দিনে ওই রকম দেখতে। চোখ পিটপিট করে। আর ভিজে বেড়ালের মতো ভালো মানুষ। কিন্তু রাত্রে ওর চোখ বাঘের মতো জ্বলে। যেন কোনো অশ্বত্থ গাছে চড়ে একটি মন্ত্র পড়লে সে গাছ শন্ শন্ করে চলতে আরম্ভ করবে। রেলগাড়ির চেয়ে জোরে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও রাতারাতি পৌঁছে দিয়ে রাত্রি ভোর হবার আগে আবার যেখানকার গাছ সেইখানে এসে দাঁড়াবে, আর বুড়ীও গাছ থেকে নেমে ভালোমানুষের মতো গৃহকর্ম করতে থাকবে। এত ওর গুণ। এ সব বানানো কথা নয়। যারা স্বচক্ষে ওর কার্যকলাপ দেখেছে, তাদের নিজের মুখ থেকে শোনা। তবে কারা যে স্বচক্ষে দেখেছে, সে আর কেউ স্মরণ করতে পারে না। তা না পারুক। প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে আছে। ডাইনীরা সব পারে। গাছ চালাতে পারে, ছোট ছেলের রক্ত চুষতে পারে, মড়ার মাথাকে কথা কওয়াতে পারে, সব পারে। কেবল একটা এতটুকু মই ডিঙোতে পারে না। তা যে পারে না বুড়ীই তার প্রমাণ। বুড়ী রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে তবু কিছুতে মই ডিঙুবে না। এর পরেও আর কি প্রমাণের দরকার?

এই বুড়ীকে সবাই ভয়ও পায়। বেশী কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করে না। পাছে খড়ের নল লাগিয়ে তার গায়ের রক্ত সব চুষে নেয়। শুধু আড়াল থেকে এবং অত্যন্ত ডানপিটে যারা তারা দূর থেকে রাগায়। বুড়ী পিছন ফিরলেই আড়ালে

গা-ঢাকা দেয়। আর চলতে আরম্ভ করলেই পিছু পিছু চলে। তাকে রাগাবার লোভও সামলাতে পারে না। আবার রাত্রে তাকে অশ্বত্থ গাছে চড়ে বন্ বন্ করে উড়ে চলে যাবার স্বপ্ন দেখে চীৎকারও করে ওঠে অনেক ছেলেমেয়ে। তবু আবার যেদিন আসবে, আবার তার পিছু লাগবে।

কিন্তু আজকে তার পিছু নিয়ে ছেলেরা সুবিধে করে উঠতে পারলে না। বুড়ী মাঠে গিয়ে পড়ল। অবারিত মাঠ। সেখানে আর আড়াল নেই। বুড়ী পিছনে ফিরলে আত্মগোপন করার সুযোগ নেই। তবু হয়তো আরও একটু যেত। কিন্তু সদানন্দের বড় ছেলে তারাপদ তাদের পথ আটকাল। তারাপদ স্টেশন থেকে আসছিল। কি একটা উপলক্ষে তাদের কলেজ দিন কয়েকের জন্যে বন্ধ। সেই ছুটিতে বাড়ি এল।

গ্রামে তারাপদর খাতির আছে। এ গ্রামে জমিদারের চেক পড়তে পারে এমন লোক বিরল। গ্রামে একটা পাঠশালা কিছুকাল থেকে হয়েছে। আগে ছিল না। তারাপদদের আমলেই প্রথম হয়। সেখানে আর সবাই যখন কালক্ষেপণ করতে লাগল, ও তখন সত্যি সত্যি পড়াশুনা করতে লাগল। এমন কি নিম্ন প্রাথমিক বৃত্তি পর্যন্ত পেয়ে গেল। গ্রামের লোকে বললে, ওই খুব হয়েছে মোড়ল, আর না। এইবার চাষে লাগাও।

সদানন্দ কিন্তু সে কথা শুনলে না। সে মাইলটেক দূরে পাশের গ্রামের মাইনার স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে এল। তারাপদ বাড়ি থেকে যাওয়া-আসা করতে লাগল। ওর সঙ্গীরা তখন মুরুব্বির মতো তামাক টানছে আর বাপের সঙ্গে চাষে বেরুচ্ছে। এখানে তামাক খাওয়াটা ভাত-মুড়ির মতো একটা খাদ্য। সে জন্যে কেউ সঙ্কোচ বোধ করে না। তারাপদ তামাক খেতে শিখল বটে, কিন্তু চাষে বেরুলো না। এমন কি সদানন্দ তাকে এক দিন মাঠে জলখাবার পর্যন্ত নিয়ে যেতে দিলে না।

তার চোখে তারাপদ যেন কি এক অমূল্য রত্ন। সন্ধ্যার পর প্রদীপের আলোয় তারাপদ জোরে জোরে পাঠ অভ্যাস করে। সদানন্দ মুগ্ধচিত্তে শোনে। তারাপদর ভবিষ্যৎ ভেবে তার সর্বাঙ্গ বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তারাপদ একটু বেশীক্ষণ পড়লে নিজের হাতে তামাক সেজে এনে খাইয়ে ছেলের ক্লান্তি অপনোদন করে। ঘরে তার খুব বেশী দুধ হত না। যেটুকু হত, তার অর্ধেকটা একা তারাপদই পেত। ঘি তো আর কেউ পেতই না।

তারও পরে অনেক কাল কাটল। তারাপদ মাইনারেও বৃত্তি পেল। সেখান

থেকে মহকুমার স্কুলে পড়তে গেল। গত বৎসর ভালো করে ম্যাট্রিকুলেশনও পাস করেছে। এর পরে আর না পড়াবার জন্যে গ্রামের সকলে আর একবার যথেষ্ট অনুরোধ করেছিল। কলেজে পড়ানোর খরচ কি সোজা! আর পড়িয়ে হবে কি? চাষার ছেলে কি জজ হাকিম হবে, না, দারোগা হবে?

কিন্তু সদানন্দ এবারও কারও কথা শুনল না। ঘরে কবছরের ধান মজুত ছিল। তারই একটা মোটা অংশ বিক্রি করে সে ছেলেকে কলেজে পাঠাল। তার পরে এই দুর্বৎসরে যে কি করে ছেলের কলেজের মাইনে, তার বই-খাতা-পেন্সিল, তার হস্টেলের খরচ, তার দামী দামী জামা-ছাতা-কাপড় ইত্যাদি যোগাচ্ছে, সে দুঃখের কাহিনী একা সে-ই জানে। কারও কাছে সে কাঁদুনি কোনো দিন গায়নি, গাওয়ার প্রবৃত্তিও হয়নি। লোকে তার ব্যয়বাহুল্য দেখে মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়েছে, সত্য মিথ্যা নানা কথা অনুমান করেছে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো প্রশ্ন করেনি। হয়তো তার শ্বশুর কিছু দেয়। অবস্থা তো মন্দ নয়। কিন্তু মৃতা কন্যার স্বামীর জন্যে আর কি সে অর্থ অপব্যয় করতে সম্মত হবে? সে যা লোক। তবে বলাও যায় না।

সদানন্দ কিন্তু হাঁ না কোনো কথাই বলে না। স্কুলে পড়ার সময়েই সে অবশ্য এই আশাতেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার বরাত মন্দ। ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার অব্যবহিত পূর্বেই তারাপদর স্ত্রী সন্তান হতে গিয়ে মারা যায়। ঘটনাটা আকস্মিক নয়। তারাপদর কাছে বহুবার তার শ্বশুর লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু পড়ার চাপে সে আর যেতে পারেনি। এত বড় দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে, এমন কল্পনাও সে অবশ্য করেনি। করলে শত পড়ার চাপের মধ্যেও একবার যেত। কিন্তু শ্বশুর সে কথা বুঝল না। জামাতার ব্যবহারে সে হাড়ে হাড়ে চটে গেল।

কিন্তু এ ঘটনা দুই বেয়াই জানল, আর জানল জামাই। গ্রামের মধ্যে এ খবর অপ্রকাশ্যই রইল।

সদানন্দ অবশ্য নানা জায়গায় ছেলের বিবাহ দেবার চেষ্টা করেছিল। অনেকে জামাতার পড়ানোর খরচ চালাতেও সম্মত হয়েছিল। কিন্তু, কেন জানি না, তারাপদ বেঁকে দাঁড়াল।

ছেলের মা বললে, থাক, থাক। সবে বউ মারা গেছে। ছেলেমানুষ। আর বেশী জেদ করে কাজ নেই।

সদানন্দও কি বুঝল, আর চাপ দিলে না। বোধ হয় পুত্রের মেজাজ দেখে আর সাহসও করলে না। নিজেই বহু দুঃখ-ধান্দা করে ছেলের পড়ার ব্যয় চালাতে লাগল।

সেই অবস্থাই চলছে।

তারাপদর একটা হাতে চামড়ার একটা ছোট স্যুটকেস, বগলে ছাতা। আর হাতে জুতো।

গ্রামে ঢুকতেই ময়ূরাক্ষী। তারাপদ খেয়াঘাটের ধারে তার স্যুটকেস, ছাতা এবং জুতো-জোড়া নামিয়ে রাখলে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা লেগেছে। সে ঘাটে নেমে বেশ করে হাত মুখ পা ধুতে লাগল। কাদা যেন আর ছাড়তে চায় না।

স্নানের ঘাটে বিনোদিনী স্নান করছিল। চোখে চোখ পড়তেই বিনোদিনী হাসলে। তারাপদও হাসলে। ওরা দুজনে প্রায় এক বয়সী। ভাবও খুব।

বিনোদিনী ও-ঘাট থেকে বললে, এই আসছ বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—ভালো ছিলে তো ?

—হ্যাঁ। তুমি ভালো আছ ?

বিনোদিনী হেসে বললে, যেমন রেখেছ।

—ছেলেমেয়ে ? হারাণদা ?

—ভালো। খেয়ে-দেয়ে এস।

—আসব।

বিনোদিনী ঘাট থেকে উঠে চলে গেল। তারাপদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে তার চমৎকার চলার ভঙ্গী। সিক্ত বসন তার সুগঠিত দেহলতাকে যেন আরও পরিস্ফুট করে তুলেছে। বামকক্ষে তার জল-ভরা পিতলের ঘড়া। দক্ষিণ-বাহুলতা চলার তালে তালে মনোহর ভঙ্গীতে দুলছে। তারাপদ মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখলে। বিনোদিনীর দেহে এতটুকু ভাঁটা এখনও আসেনি। বিনোদিনীকে তারাপদর বড় ভালো লাগে।

বাঁকের মুখে বিনোদিনী অদৃশ্য হয়ে গেল। তারাপদ রুমাল দিয়ে জুতোটা ঝেড়ে পায়ে দিলে। ছাতাটা বগলে নিলে। স্যুটকেসটা আবার হাতে তুলে নিয়ে চলতে লাগল। তারাপদর বাড়ি হারাণের বাড়ির পিছনে, খিড়কির পুকুরের ও-ধারে। খিড়কি দিয়ে দুবাড়ির মধ্যে যাতায়াতেরও রাস্তা আছে। কিন্তু সদর পথে যেতে গেলে তার রাস্তা ডান দিকেরটা। তারাপদ সেই রাস্তা ধরল। ভাবতে ভাবতে চলল, খেয়ে উঠেই হারাণের বাড়ি আসতে হবে। বিনোদিনীর দুপুরের ঐ কঘণ্টাই অবকাশ। তারপর আবার তার কত কাজ আছে। তখন আর সে মুখ তুলে চাইবার সময় পাবে না।

কিন্তু সুটকেসটা তারাপদকে আর বেশীক্ষণ বইতে হল না। দুপা যেতেই তার বাপের সঙ্গে দেখা। মাঠে গরু-লাঙল রেখে জল খেতে বাড়ি এসেছিল। সদানন্দ অকস্মাৎ পুত্রকে দেখে যেন লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বললে :

—বাড়ি আসবি তা আমাকে আগে জানাসনি কেন? রাখাল ছোঁড়াকে না হয় ইস্টিশানে পাঠাতাম। এই ভারী বাক্স এতখানি পথ তুই বয়ে নিয়ে আসতে পারবি কেন?

তারাপদ বললে, আসবার ঠিক ছিল না। শেষে দেখলাম তিন দিন ছুটি, তাই চলে এলাম।

—বেশ করেছিস। বুধী গাইটা নতুন বিইয়েছে। দুধ যেন গুড়ের মতন। মুখে দিই, তা দিতে ইচ্ছে করে না। বেশ করেছিস এসেছিস।

সদানন্দ চোখের জল আড়ালে মুছে ফেললে। মনটি তার মেয়েমানুষের মতো নরম।

তারাপদ চুপ করে রইল।

সদানন্দ আপন ঝোঁকেই বলে চলল :

দেবতা শেষকালে মুখ তুলে চেয়েছেন। বৃষ্টিটা ভালোই হয়েছে। দুটো ধান-পান হয়তো হবে। না হলে দেশে আর মানুষ বাস করতে পারত না।···মেয়েগুলো সেদিন খুব ধুম করে ব্যাঙের বিয়ে দিলে। সেই পয়েই বৃষ্টি। নইলে কি আর হত! আশা তো সব ছেড়েই দিয়েছিলাম।···দেশে জিনিসপত্রের দাম নেই। চার পয়সার হাট করলে সমানে চারটে দিন চলে যাবে। দুআনা করে মাছের সের। কিন্তু কিনবে কে? পয়সা কি আর দেশে আছে?···এই দেখ গো, তারাপদ এসেছে। ওর কলিজের ছুটি হয়েছে। তাই এল। ভাবছিলে তো?

সদানন্দ কলেজে-পড়া ছেলের সামনে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করে স্ত্রীকে 'তুমি' বলে। বহুকালের অভ্যাসের জন্যে মাঝে মাঝে ভুলে 'তুই'ও বেরিয়ে যায়।

তারাপদর জননী তখন একখানি ছিন্ন-মলিন বস্ত্র পরে মুড়ি ভাজছিল। তার আর ওঠবার উপায় ছিল না। ওইখান থেকেই হাসিমুখে বললে, এসেছিস? বেশ করেছিস। অনেক দিন চিঠি পাইনি। কালকেই কত ভাবছিলাম। ওরে তোর দাদাকে একখানা চাটাই দে।

দিতে আর হল না। তারাপদ নিজে একখানা চাটাই টেনে বড় ঘরের দাওয়ায়

বসল। হাতের রুমাল ঘুরিয়ে বাতাস খেতে লাগল। তার নধর কান্তি দেখে জননীর মন খুশিতে ভরে উঠল।

বললে, একটু জিরিয়ে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেল। আমি তোর জন্যে দুটি হুড়ুম ভেজে দি। আর খেতে দুটো শশা পাও কি না দেখ না গো। দুটি শশার জালি সেদিন দেখেছিলাম যেন। এতদিনে হয়তো একটু বড় হয়েছে।

তারাপদর ছোট্ট ছোট্ট ভাই দুটি ততক্ষণে তার সুটকেসের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বললে, মিট্টি? আমাদের মিট্টি কই?

—ওই যা!

তারাপদ প্রতিবার এদের জন্যে শহরের সন্দেশ আনবার সঙ্কল্প করে। কিন্তু প্রতিবারই ভুল হয়ে যায়।

সদানন্দ একটা ধমক দিয়ে বললে, মিট্টিঃ? মিষ্টি কি হবে? অমন কাঁচা সোনার রঙের গুড় রয়েছে তা মনস্তর হয় না?

তারাপদ পকেট থেকে দুটো পয়সা বার করে দুজনের হাতে দিয়ে বললে, আচ্ছা, এই নে। মিষ্টি কিনে খাস।

তারা মহানন্দে পয়সা নিয়ে দূরে সরে বসল। বাবার ধমকের ভয়ে আর দাদার কাছে যেতে সাহস করলে না।

সদানন্দ মাঠে লাঙল ছেড়ে দিয়ে এসেছে। তার বেশীক্ষণ বসবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির পিছনের তরকারির খেতে শশার সন্ধানে গেল।

তারাপদ এদিক ওদিক চেয়ে বললে, কিশোরী কই মা?

মা জিভে একটা টাকান্ দিয়ে বললে, তাকে এখন দেখতে পাবি? গাঁয়ের সব গাছগুলোয় একবার করে চড়া হোক। দুপুর গড়িয়ে না গেলে সে ফিরবে না।

তারাপদ হেসে ফেললে।

—হাসি নয় বাবা! ও যে কি দস্যি মেয়ে হয়েছে—তুই বাইরে থাকিস, জানতে তো পারিস না। সেদিন পালেদের আমগাছ থেকে পড়ে সমস্ত পা রক্তারক্তি করে ফিরল। কাপড়খানার তো চিহ্নই নেই। কোন দিন হাত-পা ভাঙবে দেখিস। তখন কি করে বিয়ে দিবি দিস।

তারাপদ হেসে বললে, বড় হলে আপনিই সেরে যাবে।

—বড় কি হয়নি না কি? দশ বছরের ধাড়ী। অমন বয়সে আমরা দুবার শ্বশুরঘর করে গিয়েছি।

মা রাগের সঙ্গে কতকগুলো তুঁষ উনোনের মধ্যে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলে।

তারাপদ বললে, একটু শাসন কোরো।

—শাসন? ওই ধেড়ে মেয়ে শাসন মানে? তুই তো বিয়ে দিতে দিবি না কিছুতে। কি যে বুঝিস, তুই জানিস।

এমন সময় কিশোরী লাফাতে লাফাতে বাড়ি এসেই দাদাকে দেখে থমকে গেল।

মা বললে, এই যে! ধিঙ্গি মেয়ে নাচতে নাচতে পাড়া বেড়িয়ে ফিরলেন। ওটাকে দেখলে বিষ লাগে!

তারাপদ হাসলে।

তা দেখে কিশোরীও হাসলে।

মা ঝঙ্কার দিলে, আহা, রূপের মাধুরী! পাড়া বেড়ানো হয়নি এখনও সব? না হয় তো ঘুরে এস। সূয্যি ডুবতে এখনও দেরি আছে।···আবার ওই পাড়া-বেড়ানোর কাপড়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে! যা শীগ্‌গীর খিড়কির পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে এসে দাদাকে জল খেতে দে!

তারাপদ হেসে বললে, আমি যে এই কাপড়ে ঘরে ঢুকেছিলাম মা। তাতে কই দোষ হল না?

—ব্যাটা ছেলের আবার দোষ আছে না কি?

—তা ঠিক।—তারাপদ হাসলে।

কিশোরী বললে, তেল কই?

—আহা! কি যে কণ্ঠ! যেন শাঁকচুন্নী ডাকছে!

কিশোরী অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে গুন গুন করে বললে, তেল দেবে না কিছু না, খালি বকুনি!

—তেল আমার মাথার ওপরে রয়েছে! চোখে পোকা পড়েছে তোমার? চোঙে তেল আছে দেখতে পাও না?

দুটি শশা নিয়ে সদানন্দ ফিরল। বেশী বড় নয়, ছোটই।

বললে, আমি আর বসতে পারলাম না, মাঠে চললাম। ফিরে এসে পুকুর থেকে ঘাট-জালে দুটো মাছ ধরে দোব বরং। আর যদি মাছ আসে তো তাই নিও।

তারাপদর মা ইশারায় বললে পয়সা নেই। ছেলের সামনে অর্থাভাবের কথাটা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল।

সদানন্দ বললে, চাল দিয়ে নিও। কি বরং···

তারাপদ বুঝতে পারলে। তাড়াতাড়ি বললে, নিও না মাছ! পয়সা তো আছে আমার কাছে।

—তবে আর কি!

আশ্বস্ত হয়ে সদানন্দ চলে গেল।

ওর পয়সা নিতে মায়ের ইচ্ছা ছিল না। পাছে কম পড়ে যায়। মায়ের চোখ ছিল ছেলে দুটোর পয়সার উপর। যাক গে, সে পরে হবে। আপাততঃ কিশোরীকে একটা ধমক দিয়ে বললে, কি হল? চান করতে গেলি না যে?

—যাই।

—যাই, তো দেরি করছিস কেন?

কিশোরী তাদের দিকে পিছন ফিরে কি জন্যে যেন ইতস্ততঃ করছিল। তারাপদ চুপি চুপি এসে তার পিছনে দাঁড়াল। কিশোরীর পেট-কাপড়ের আঁচলে যেন কি আছে। তাই নিয়ে ও মহামুশকিলে পড়েছে।

মৃদু হেসে তারাপদ বললে, কি ওগুলো?

কিশোরী প্রথমে চমকে উঠল। তারপর আঁচল থেকে কতকগুলো ফলসা বার করে দাওয়ায় রাখলে।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, ফলসা কোথায় পেলি?

মা বললেন, ওর আবার ফলসার ভাবনা? কোন্ মুল্লুক থেকে নিয়ে আসছে। দিনরাত গাছে-গাছেই তো ঘুরছে।

কিশোরী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, হাঁ ঘুরছে।

—না ঘুরছে না? আবার চোপা দেখ না! দোব নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে।

কিশোরী হয়তো আরও বকুনি খেত। তারাপদ তাকে স্নান করতে পাঠালে। চোখ তার ছলছল করছিল। মায়ের কাছে বকুনি খাওয়ার জন্যে নয়। অমন বকুনি সে প্রত্যহ সহস্রবার খাচ্ছে। মায়ের কারণে-অকারণে বকুনি তার অঙ্গের ভূষণ হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য তাও সে জানে না। কিশোরী বলতে চেয়েছিল, সকাল থেকে সে ফলসার জন্যেই ঘোরেনি। লোকমুখে দাদার আসার খবর পেয়েই দাদার জন্যে ফলসা তুলে এনেছে। বোধ হয় সেই কথা বলতে না পেরেই চোখ তার ছলছল করে উঠল।

কিশোরী বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছে খিড়কির ঘাটেই নাইতে গেল। দূরের পদ্মপুকুরে যাওয়ার সময় নেই। ফিরে এসে দাদার জন্যে জলখাবার বের করে দিতে হবে।

দুপুরবেলায় তারাপদ গেল হারাণদের বাড়িতে।

—বড় বৌ গো!

—এস ভাই এস।

বিনোদিনী দাওয়ায় আঁচল পেতে শুয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় ভালো করে কাপড় দিয়ে উঠে বসল। তারাপদ তার অনতিদূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, হারাণদা কই?

বিনোদিনী আঙুল দিয়ে ঘরের ভিতরটা নির্দেশ করলে।

হারাণ ভিতর থেকে সাড়া দিলে, কখন এলি রে?

—সকালবেলায়। ঘরের ভেতর করছ কি?

বিনোদিনী ব্যঙ্গ করে বললে, রাজকায্য।

হারাণ সামনে থাকলে অন্য লোকের উপস্থিতিতে বিনোদিনী কথা কয় না। অন্তরালে থাকলে কয়।

হারাণ তার কথা শুনতে পেলে। হেসে বললে, একটা ঝুড়ি বুনছি ভাই। কদিন থেকেই কঞ্চি চিরে রেখে দিয়েছি। আজ ভাবলাম···ভালো ছিলি?

—ছিলাম একরকম।

—ওদেশে বর্ষা কেমন?

—তা হয়েছে। তবে শহরে আবার বর্ষা।

—কেন?

—ওরা তো আর চাষবাস করে না। জমি জায়গারও বালাই নেই।

—নেই? তবে খায় কি?

বিনোদিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, শোন চাষার কথা। সে কি চাষার গাঁ, যে লোকে চাষ করে খাবে? ভদ্রলোকের জায়গা। চাকরিবাকরি করে।

হারাণ গম্ভীরভাবে বললে, তা বটে।

বিনোদিনীকে দেখলে তারাপদর আশ্চর্য লাগে। মুখের এই শ্রী, দেহের এই কান্তি, ত্বকের এই মসৃণতা এবং সর্বোপরি তার বাক্যের সরসতা এই আবেষ্টনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদেশী মনে হয়। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মূলগত অনৈক্য আছে। অথচ সে এই অঞ্চলেরই মেয়ে। এদেরই মতো মানুষ হয়েছে। এদেরই মতো অশিক্ষিতা। অথচ তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দেখে তারাপদর কিছুতে বিশ্বাস হয় না যে, সে লেখাপড়া কিছুই জানে না। একমাত্র বিনোদিনীর রূপ ছাড়া এমন ধারণা জন্মাবার আর কোনো সঙ্গত কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ কথা সে বিনোদিনীকেও কতবার বলেছে। বলেছে, এখানে তোমাকে মানায় না বড়বৌ। তোমাকে মানায় শহরে।

বিনোদিনী হেসে বলেছে, কেন, আমি কি ?

—তা জানি না। কিন্তু তুমি আসলে এখানকার নও।

আপনার উপর তারাপদর চোখের দৃষ্টি অনুভব করে সেই কথা বিনোদিনীর মনে পড়ল।

বললে, এবার আমাকে একবার শহরে নিয়ে চল ঠাকুরপো।

অতদিন আগের কথা তারাপদর মনে ছিল না। বললে, হঠাৎ ?

—দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

—বেশ তো।

—কবে যাবে ?

—যেদিন তুমি নিয়ে যাবে। তোমার ছুটি শেষ হলেই। এখানে আর ভালো লাগছে না।

—তাই চল। হারাণদাকে সুদ্ধ নিয়ে যেতে হবে তো ?

—ও কোথা যাবে ? চাষা লোক। জমি জায়গা চাষ করবে। গরু-বাছুরকে খেতে দেবে। ও থাকবে। আমি একলা যাব।

হারাণ ঘরের ভিতর থেকে হেসে উঠল। বললে, কি আমার ভদ্দর লোক রে !

—বটি তো। ওর চেয়ে তো বটি।

হারাণ হাসলে। বললে, যা কেন। গিয়ে একবার শহরের মজাটা দেখে আসবি। আমি শহর যাইনি মনে করেছিস ? একবার গিয়েছিলাম।

হারাণ হাসতে হাসতে বাইরে এসে দাঁড়াল। বিনোদিনী একটু আড়-ঘোমটা টেনে দিলে।

হারাণ বললে, একদিনে দম বেরিয়ে যাবে, সে তো আমাদের কমলপুর নয়। না মাঠ, না ময়ূরাক্ষীর ঘাট, না একটা কথা কইবার মনিষ্যি। যা কেন !

বিনোদিনী ঘোমটার অন্তরাল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ফিস ফিস করে বললে, হ্যাঁ ঠাকুরপো, সত্যি ?

হারাণ হেসে বললে, ওই বলুক কেন, সত্যি না মিছে। আমার সব দেখা আছে।

বলে খুব ভারিক্কী চালে আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঝুড়ি বুনতে বসল। এমন সময় বাইরে রাখালের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, গরু বাঁধ গো !

হারাণকে ঝুড়ি রেখে উঠতে হল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, শহরের মেয়েরা না কি ঘোমটা দেয় না? জুতো পায়ে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়? সত্যি?

—সত্যি।

গালে হাত দিয়ে বিনোদিনী মধুর হেসে বললে, মাগো! লজ্জা করে না?

—লজ্জা কিসের! রঙ-বেরঙের শাড়ী পরে সেজেগুজে যখন মেয়েরা বেরোয় চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিনোদিনী খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, তাইতেই বুঝি তুমি বিয়ে করতে চাইছ না! পাড়াগাঁয়ের মেয়েতে আর মন উঠছে না!

তারাপদ অপ্রস্তুত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বিনোদিনী বললে, বুঝেছি, বুঝেছি। আর সাফাই গাইতে হবে না। তা বললেই তো পার বাপু। না হয় শহরের মেয়েই আনা হোক। আমরাও দুদিন শহরের মেয়ে দেখে চক্ষু জুড়োই।

তর্কে বিনোদিনীকে হারানো অসম্ভব।

তারাপদ মরিয়া হয়ে বললে, তা না হয় আনলাম। কিন্তু রাখব কোথায়?

—কেন, তমালবনে কুঞ্জ বাঁধতে হবে না কি?

তারাপদ হেসে বললে, কুঞ্জ কেন, শহরের মেয়ে জুতো-পরা চরণ রাখবে কোথায়? এই প্যাচপেচে কাদায়?

—কেন, তোমার কোলে।

বলে বিনোদিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে যেন হেসে গড়িয়ে পড়ল। মুখ রাঙা করে তারাপদ বললে, যাও!

হারাণ গরু বেঁধে ফিরে এসে ওদের ওই অবস্থায় দেখে বললে, কি হল?

বিনোদিনী মুখে আড়-ঘোমটা টেনে ফিস ফিস করে বললে, বলব তোমার দাদাকে?

কৌতুকে তার চোখ দুটি নাচছিল।

তারাপদ বললে, আহা!

হারাণ বুঝলে দেওর-ভাজে কিছু একটা রসিকতা হচ্ছে। সে আর দাঁড়াল না। ধানের বীজ বোধ হয় কিছু কম পড়বে। বৃষ্টির অভাবে অনেকেরই কিছু কিছু বীজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক বনমালীর কাছে যদি পাওয়া যায়। নইলে আবার পাশের গ্রামে চেষ্টা দেখতে হবে।

হারাণ সেই চেষ্টায় বেরিয়ে গেল৷

তারাপদ বললে, এই যে আমার সামনে হারাণদাকে ঘোমটা দিলে বড়বৌ, তার মানেটা কি হল? হারাণদার সঙ্গে যে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই এই কথাটা আমাকে বিশ্বাস করাতে চাও। কেমন কি না?

বিনোদিনী নিস্পৃহভাবে বললে, যা মনে কর।

—কই হাবলের সামনে তো লজ্জা কর না?

—ও তো ছোট ছেলে।

—যখন বড় হবে তখনও তো লজ্জা করবে না। কেউ করে না। যখন গঙ্গা-স্নানে যায়, অতি লজ্জাশীলা মেয়েও তো কই লজ্জা করে না? মেয়েদের লজ্জার যে কি মানে আমি বুঝি না। কখনও মনে হয়, গুরুজনের সামনে নিজেকে ভালো করে আবৃত করে তারা গুরুজনকে সম্মান জানায়। কখনও মনে হয় পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির আঘাত থেকে তারা নিজেকে বাঁচাতে চায়। কোন্‌টা ঠিক জানি না। হয়তো দুটোই ঠিক। কি বল?

বিনোদিনী জবাব দিলে না। শুধু একটু মুচকে হাসলে।

তারাপদ বললে, সত্যিকার মেয়ে তো দেখনি বড়বৌ। বিদ্যুতের মতো রূপ। তারা নিজেরা অভয় না দিলে পুরুষের সাধ্য কি তাদের পায়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

বিনোদিনী বোধ হয় একটু চটল। বললে, আর আমরা বুঝি খুব সস্তা? আমাদের কাছে:আসবার জন্যে বুঝি অভয় নেবার দরকার করে না?

না, তা নয়। তারাপদ অপ্রস্তুত হয়ে বললে,—আমি তোমার কথা বলছি না। কিন্তু দেখলে শ্রদ্ধা হয়, এমন মেয়ে তো পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ে না।

তেমনিভাবে বিনোদিনী বললে, কেন পড়ে না? তারা পেরজাপতির মতো দিনরাত পাখনা মেলে বেড়ায় না, তাই?

—কি জানি।

তারাপদ কথাটা একটু ভাবলে।

বিনোদিনী তার সুন্দর গ্রীবায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, সেই জন্যেই। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা মুখে খড়ি মেখে রূপ দেখাতে ভালবাসে না।

—কেন বাসে না? রূপ দেখানোটা কি লজ্জার? ভগবান রূপ দিয়েছেন কেন?

—পরপুরুষ ভোলাবার জন্যে।

—আর স্বামী?

বিনোদিনী ফিক করে হেসে ফেললে। বললে, স্বামীকে ভোলাবার দরকার করে না।

—কেন? স্বামী বেচারা বিয়ে করে এমন কি অপরাধ করেছে?

নাক সিটকে বিনোদিনী বললে, মরণ আর কি! স্বামীকে আবার নটী সেজে ভোলাতে হবে না কি? গলায় দড়ি!

তারাপদ অবাক হয়ে গেল।

বললে, তোমার অমন রূপ বড়বৌ, কোনোদিন সেজেগুজে হারাণদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না যে হারাণদা একবার চেয়ে দেখুক।

কোপ কটাক্ষ হেনে বিনোদিনী বললে, থাম ঠাকুরপো! মরণ আর কি!

তার ক্রোধ দেখে তারাপদ বড় কৌতুক অনুভব করলে। বললে, সে হচ্ছে না বড়বৌ। এক্ষুণি গিয়ে আমি ফুল তুলে আনছি। ফুলের বালা, ফুলের অনন্ত, ফুলের চন্দ্রহার, ফুলের মুকুট গাঁথছি দাঁড়াও। আজ সন্ধ্যেয় তাই দিয়ে তোমায় সাজাব।

বিনোদিনী হেসে বললে, তার আগে আমি গলায় দড়ি দোব।

—এত?

—না তো কি!

একটু চুপ করে থেকে তারাপদ হঠাৎ বললে, তবে কি ভালো লাগে বড়বৌ, সমস্ত রাত ঝগড়া করতে?

মুখ নামিয়ে হাসতে হাসতে বিনোদিনী বললে, হুঁ।

—তাতে কি সুখ?

—তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।

বিনোদিনী হাসলে।

একটু পরে তারাপদ উঠে বললে, এইবার উঠি বড়বৌ। তোমার অনেক কাজ করবার আছে।

চারটে বাজে। বিনোদিনীর অনেক কাজই করার আছে বটে। কথায় কথায় বেলা যে পড়ে আসছে তা তার খেয়ালই হয়নি।

বিনোদিনী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আছ তো কদিন? আবার এস। তোমার সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলে আর বেলার দিকে খেয়াল থাকে না। আবার এস যেন।

—আসব।

তারাপদ চলে গেল।

বিনোদিনী ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দিতে আরম্ভ করল। তারাপদর সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণ তার অনেক কাজ সারা হয়ে যায়। দুটো ধান ভানতে হত, সে তো হলই না। এখন এত বড় উঠোন, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া, বিছানা করা, প্রদীপের সলতে পাকানো, গরুর শানি কাটা, গোয়ালের পাৎনায় শানি দেওয়া, ওরই মধ্যে মাথায় এক খাবলা তেল দিয়ে চুল বাঁধাও আছে। এই কাজ সারতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। সন্ধ্যার সময় গা-ধুতে যেতে তার বড় ভয়। অশ্বত্থ গাছটার নীচেটা এমন অন্ধকার হয়ে থাকে যে, চাইতে ভয় হয়।

বিনোদিনী চটপট করতে লাগল। তবু কাজ আর এগোয় না। কাজ করতে করতে হাত তার এলিয়ে আসে। চোখ ঝিমিয়ে আসে। হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

ওই যে বলেছে ফুলের বালা, ফুলের অনন্ত, ফুলের চন্দ্রহার। তারই সঙ্গে সঙ্গে জাগে পুলকিত জ্যোৎস্না যামিনী, ঘুমভাঙা দু-একটি পাখির ডাক। আরও মনে পড়ে। কাকে তা সে বলতে পারে না। তা সে নিজেও জানে না। যার নাম জানে না, শুধু আভাস জাগে এমন কাকেও। তাকেই পাওয়ার আনন্দে তার সর্বদেহে শিহরণ জাগে কদম্ব ফুলের মতো।

বিনোদিনীর ঘরের কাজ আর ভালো লাগে না।

সন্ধ্যাবেলা হারাণ বড় ঘরের দাওয়ায় বসে বসে পা দোলাচ্ছে, আর বিনোদিনী রান্নাঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে। এদের বাড়ি রাত্রে রান্নাবাড়ার হাঙ্গাম নেই। দিনের জল দেওয়া ভাত আছে, আমড়া দিয়ে মাছের টক আছে, তার সঙ্গে দরকার হলে কলাই গুঁড়িয়ে দেবে। ব্যস। এই সময় সবাই একটু গা গড়িয়ে নেয়। ছেলে দুটোকে সূর্যাস্তের আগেই ভাত খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। রাত্রে খানিকটা দুধ খাবে। হারাণ সমস্ত দিন খেটে খুটে এসে এখন একটু ঘুমোবে। বারোটার ট্রেন গেলে উঠে ভাত খাবে। আর যখন খাটুনি থাকবে না, তখন পালেদের বৈঠকখানায় রাত বারোটা পর্যন্ত গল্পে কাটিয়ে আসবে। আর নয়তো রামায়ণ মহাভারত পাঠ যদি হয় তাই শুনবে।

আজকে চাষের খাটুনি গেছে। আজ আর কেউ জুটবে না। হারাণ পা দোলাচ্ছিল আর ঝিমুচ্ছিল। এমন সময় রসিক পালের বাড়ি থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে রসিকের মেজ ছেলেটা কেমন করছে।

হারাণের আর ঝিমুনো হল না। রসিকের বাড়ির দিকে ছুটল।

দেখে, ছেলেটাকে তিন চারজন লোক জোর করে ধরে আছে। আর সে তাদের মধ্যে থেকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠছে। গা যেন আগুন। ছেলেটা আপন মনে ক্রমাগত বকছে। কি যে বকছে তার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ বিকালেও সে ভালোই ছিল। বাঁশ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ওদিকে ওই। এদিকে তার মা পা ছড়িয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে কাঁদতে বসেছে।

ভিন্ন গ্রাম থেকে ডাক্তার আনতে লোক গেল। গ্রামের ডাক্তার নাড়ি টিপে, বুকে পিঠে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, এখানে ওখানে আঙুলে টোকা দিয়ে বললে, কুমি-বিকার।

পদ্মপিসি সেই থেকে রোগীর কাছে বসে আছে। বললে, এখনি জ্বর হল, এখনি বিকার। বিকার আমরা দেখিনি ? ওসব কিছু না, এ সেই ডাইনী মাগীর কাজ !

কথাটা চট করে সকলের মনে লেগে গেল।

রসিকের স্ত্রী কান্না থামিয়ে নাকী সুরে বললে, তাই বটে গো, তাই বটে। আজ সকালেই সে আবাগী এসেছিল। ওরা তাকে রাগাচ্ছিল, সে-ই নজর দিয়েছে।

ছেলের দল সাক্ষ্য দিল, মাগী একটা খড় মুখে দিয়েছিল বটে।

আর কারও সংশয় রইল না।

নরোত্তম ওঝা এল। লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি। মাথার চুল পিছনে ঝুঁটি বাঁধা। গায়ে বৈষ্ণবের আলখাল্লা। গলায় হরেক রকমের মোটা সরু মালা। নেকড়ে বাঘের মতো বড় বড় দাঁত। হাসলেই চক চক করে ওঠে। মোটা মোটা শিরা সর্বাঙ্গে শিকড়ের মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

নরোত্তম উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতর থেকে রোগী প্রথমে চীৎকার করে উঠল। তারপর অশ্রাব্য গালাগালি আরম্ভ করলে। হাতের লাঠিটা দিয়ে নরোত্তম নিজের চারদিকে একটা গণ্ডি টেনে নিলে। খানিকটা ধুলো মন্ত্র পড়ে নিজের সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে। তারপর রোগীকে বাইরে আনতে বললে।

একজন বাইরে একটা মাদুর পাতলে। কয়েকজন রোগীকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে সেখানে শুইয়ে দিলে। রোগী কি আর শোয় ? সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো তড়াক করে উঠে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসল। এরই মধ্যে গায়ের রঙ কে যেন কালি দিয়ে লেপে দিয়েছে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বলছে। চোখে আর পলক পড়ছে না। সে একদৃষ্টে ওঝার দিকে ঠায় চেয়ে।

ওঝা দূর থেকে বহু রকম মন্ত্র পড়ে, বহু দেবতাকে আহ্বান করে, ডাইনীর

উদ্দেশ্যে বহু অকথ্য কটু কথা উচ্চারণ করে, আর এক একবার দূর থেকে তার গায়ে ধুলো ছিটিয়ে দেয়। রোগী কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বিশ্রী গালিগালাজ করে।

কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। এত কটূক্তি নিরাপদে হজম করে ডাইনী আবিষ্ট ব্যক্তির স্কন্ধত্যাগ করল না।

ওঝা বললে, এ বড় শক্ত ডাইনী। এ অঞ্চলের নয়। এ অঞ্চলে এত বড় ডাইনী কেউ নেই, যে আমাকে দেখে ভয়ে না পালায়।

রোগী হাসলে।

ওঝা চীৎকার করে বললে, তুই যাবি কি না বল?

উত্তরে রোগী হাসলে।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

—না।

—যাবি না?

রোগী নিরুত্তরে তেমনিভাবে বসে রইল।

ওঝা তার শেষ অস্ত্র ঝাড়বার জন্যে প্রস্তুত হল। বললে, একটা হাতায় করে খানিকটা আগুন আর এক মুঠো ধূপ দাও তো। দেখি ও কত বড় ওস্তাদ!

রোগী ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো অব্যক্ত আর্তনাদ করে কি বললে বোঝা গেল না।

অন্ধকার রাত্রি। বাড়ির পিছনের বাঁশ ঝাড় হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে। তার গায়ে গায়ে অসংখ্য জোনাকি পোকা যেন জমাট অন্ধকারকেই আরও পরিস্ফুট করছে। উঠোনের নিমগাছটির ডালে ডালে যেন অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। একটা হুটিটি পাখি অমঙ্গলসূচক শব্দ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। রসিকের উঠোনটিতে আর তিল ধরার স্থান নেই। গ্রামের সমস্ত লোক গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দেখবার আগ্রহও নেই। সমস্ত আগ্রহ রোগীর উপর গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। নিশ্বাস রোধ করে সকলে ভীষণ কিছু পরিসমাপ্তির প্রতীক্ষা করছে। একে অন্ধকার রাত্রি। তার উপর রোগীর আহত জন্তুর মতো অব্যক্ত আর্তনাদ এবং ওঝার বাহ্বাস্ফোট ও কুর্দন। সমস্ত মিলে রাত্রিকে যেন ভীষণতর করে তুলেছে।

একটা হাতায় গন্‌গনে খানিকটা আগুন এল; আর খানিকটা ধূপ।

রোগী শ্রান্ত কুকুরের মতো ধুঁকছিল। এখন সোজা হয়ে উঠে বসল। তার অস্বাভাবিক হাস্যধ্বনিতে উপস্থিত জনতা শিউরে এক পা পিছিয়ে গেল।

হাতাটা হাতে নিয়ে ওঝা দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়তে পড়তে গণ্ডির ভিতর খানিকটা তাণ্ডব নৃত্য করলে। তারপর মুঠোয় করে খানিকটা ধূপ নিয়ে ছিটিয়ে দিলে। ধূপ আগুনের স্পর্শ পাওয়া মাত্র জ্বলন্ত খৈএর মতো ছিটকে রোগীর গায়ে পড়তে লাগল। কিন্তু রোগীর তাতে কোনো চাঞ্চল্য নেই। তৃষ্ণার্ত প্রাণীর মতো হাঁ করে সেগুলো খেতে যায়। সে দৃশ্য দেখে লোকের গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ওঝা আবার হুঙ্কার দিয়ে বললে, এখনও যাবি? না আগুনে পুড়ে মরবি?

রোগী হা হা করে প্রেতের মতো হেসে উঠল।

—তবে মর।

বলে ওঝা আবার ধূপের বাণ ছুঁড়তে লাগল।

দুবার তিনবার এই রকম করার পর মনে হল রোগী যেন ক্রমে নেতিয়ে আসছে। আর আগের মতো হাসতে হাসতে ধূপের খৈ খেতে যাচ্ছে না। বরং খৈ যখন ছিটকে আসছে তখন যেন সঙ্কুচিতভাবে পিছিয়ে আসতেই চায়। পিছনে দেওয়াল থাকায় পারছে না। রোগীর টকটকে জবাফুলের মতো লাল যে দুটো চোখ এতক্ষণ ক্রোধে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল, তা যেন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছে।

এক একবার বাণ খাওয়ার পর যেন ধুঁকছে।

ওঝা আর একবার হুঙ্কার ছেড়ে বাণ ছুঁড়তেই রোগী এবারে আর পারলে না। সভয়ে চীৎকার করে উঠল।

—এইবার যাবি? না আরও চাস?

রোগী খেঁকী কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ওঝা ধমক দিলে, যাবি কোথায়? দাঁড়া। আগে তুই কে তাই বলে যা।

রোগী আবার কেঁদে উঠল। কিছুতে সে নাম বলতে রাজী নয়। ওঝাও ছাড়বে না। অবশেষে বলতে হল। নাম বললে, ঈশানী।

ও নাম এদিকের কেউ শোনেনি। কিন্তু ওঝা তাকে চেনে বোধ হল।

বললে, ঈশানী? তুই এদিকে কি করতে এসেছিলি?

ঈশানী কিছুতে তা বলবে না। অবশেষে ওঝার ধমকে বলতে হল। বললে ন্যাড়া বটগাছে বসেছিলাম। তলা দিয়ে কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে যাচ্ছিল। দেখে লোভ হল।

ন্যাড়া বটগাছ ! সে তো বিলের ধারে ! সেদিকে কি মুড়ি খেতে খেতে কোনো-দিন গিয়েছিলে ? কেউ সন্দেহভরে ঘাড় নাড়তে লাগল। কেউ বা বিজ্ঞভাবে মাথা দোলাতে লাগল। স্পষ্ট করে কেউ কোনো কথা বললে না।

—আর কখনও আমার এলাকায় এমন কাজ করবি ?

—না।

—তুই যে গেলি তা জানব কি করে।

—তোমার জুতোটা দাঁতে করে নিয়ে যাচ্ছি।

ওঝা হাসলে। বললে, অত সস্তায় পার পাবে না। উঠোনে যে জলভরা ঘড়া আছে সেইটে দাঁতে করে নিয়ে যেতে হবে।

ঈশানী আবার করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ওঝা কাকুতি শোনবার পাত্র নয় ! রোগীকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে উঠতে হল। উঠোনে নামতে হল। ঘড়াটা দাঁতে করে নিয়ে টানতে টানতে বাইরের দরজার দিকে যেতে হল।

লোকে তো অবাক। ওই রোগগ্রস্ত দুর্বল ছেলেটির দ্বারা এই শক্তিসাধ্য কাজ কি করে সম্ভব হতে পারে তা ভেবেই পেল না। সকলে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইল।

রোগী ঘড়াটা নিয়ে টানতে টানতে চলে। উঠোন পার হল। নিমতলা পার হল। রান্নাঘরের বাঁকটা পার হয়ে চলল। হঠাৎ বার-দরজায় এসেই ঘড়াটা ছেড়ে দিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। কোনো সংজ্ঞাই রইল না।

ওঝা রোগীকে বারান্দায় নিয়ে এসে চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে বাতাস করতে বললে। যারা এতক্ষণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল, তাদের সরে যেতে বললে।

ঘণ্টাখানেক বাতাস করার পরে রোগীর জ্ঞান হল। তার মা তখন আর একবার ডাক ছেড়ে কাঁদবার অবকাশ পেলে।

এই কাণ্ড দেখে এসে বিনোদিনীর রাত্রে ঘুমও হল না, স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত নৈশ-কলহও বাদ গেল। স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে নিজে একবার নামমাত্র আহারে বসল। হারাণ বাইরে বসে আছে, তবু প্রদীপের আলোয় নিজের দীর্ঘ ছায়া দেখেই ভয় পেতে লাগল। আহার হল না। কোনোরূপে নাকে মুখে দুটি দিয়েই উঠে পড়ল। শুধু তাই নয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরেও ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে স্বামীকে জড়িয়ে ধরতে লাগল।

ভয় গেল সকালে। সূর্যের আলোয় সমস্ত স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে। কোনো রকমে নামমাত্র বাসী পাট সেরে সব খিড়কির ঘাটে গিয়ে সেই যে জমল, আর ওঠবার

নাম করে না। পুরুষবর্গ মাঠে গেছে। সেদিকে কোনো তাড়া নেই। তাড়া দিচ্ছে ছেলেমেয়েগুলো। কিন্তু কে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে?

—কী কাণ্ড! ভয়ে আর সারা রাত বাঁচি না!

—হ্যাঁ, ওঝা বটে মা! ছেলে তো গিয়েছিল!

—কি খাওয়াটাই খেলে বোন! স্বচক্ষে দেখলাম কি না! পান্তা ভাত নিলে এক খোরা। পেঁয়াজ দিয়ে কলাই বাঁটা নিলে এক তাল। চিংড়ি মাছ দিয়ে আমড়ার টক হয়েছিল, তা নিলে এক বাটি। নিয়ে, কাঁচা তেল দিয়ে, নুন দিয়ে ভাতগুলো মাখিয়ে সপর সপর করে খেতে লাগল। খালি বলে দে, দে। তিনজন মনিষ্যির খাওয়া খেলে একলা ওই এক ফোঁটা ছোঁড়া। কি রাক্ষুসে খাওয়া মা! তখনি বুঝেছিলাম……

—খাবে না কেন বাছা! ও কি আর ও খাচ্ছিল। খাচ্ছিল সেই ডাইনী মাগী।

—তাই বটে মা!

—তা ওঝা বটে ভাই! কটাকা দিলে?

—দেবে আর ছাই! ও রসিক পালের পরিবার। কেঁদে কেটেই খালাস। (কথাটা চুপি চুপি বললে)।

—তাই বটে মা!

—মরণ আর কি! ছেলের চেয়ে টাকা বেশী হল?

—যদি ছেলের ভালোমন্দ কিছু হত?

—অমন করে বাঁচালে! বড় ডাক্তার এলে কত নিত তা একবার ভাব!

—আচ্ছা, ওঝা যে অমন করে, ওর ভয় করে না?

—ওর কাছে ঘেঁষবে কে? তবে আর ওঝা কি?

—তাই বটে মা!

—না, ভয় আবার করে না! সন্ধ্যের পরে একলা ওঝা কোথাও বেরোয় না। বাগে পেলে ওকে কি ছাড়বে ভেবেছ?

বিনোদিনীর বাড়ির ভিতর একতারার ঝঙ্কার উঠল। সে আর দাঁড়াতে পারলে না। বললে, আমি যাই। বাড়িতে কে ভিক্ষে নিতে এসেছে। একতারার আওয়াজ পেলাম।

—মুখে আগুন ভিখিরীর। কত ভিক্ষে দোব? যেন পিঁপড়ের সার লেগেছে।

বিনোদিনী আর কথা বাড়ালে না। বাসনের গোছা হাতে করে বাড়ি ঢুকল। হ্যাঁ, সেই বটে! কেবল এই কদিনের তেলে জলে শরীরটি একটু চিকন হয়েছে।

গৌরহরি তখন গান ধরেছে :

> প্রেমপাথারে যে সাঁতারে তার মরণে ভয় কি আছে ?
> হিংসা নিন্দা ভয়ং নাস্তি জাতি কুল মান সব গিয়াছে।
> পাগল নয় পাগলের পারা, দু'নয়নে বইছে ধারা,
> যেমন স্বরধুনীর ধারা ত্রিধারায় ধারা মিশে গেছে।
> রূপ রস স্পর্শ শব্দ গন্ধ, পঞ্চতত্ত্ব নিত্যানন্দ,
> তাঁর হয়েছে প্রেমানন্দ, নিরানন্দের ভয় গিয়াছে।
> গোঁসাই মণিমোহনের মনোহরা রাইরূপেতে গিল্টি করা,
> সেই জেনেছে মানসধরা, ঝাঁপ দিয়ে নদেয় উঠেছে ॥

গান থেমে যাওয়ার পরে বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গলা ঝেড়ে বললে, খবর সব ভালো ?

—রাধারানী যেমন রেখেছেন।

বিনোদিনী হেসে বললে, সে তো তোমাকে। আমাদের বাড়ির ?

—ভালোই।

—ললিতার খবর পেলে ?

গৌরহরি চুপ করে রইল !

—আর রাগ করে থেক না। বুঝলে ? ছেলেমানুষ, ভুলে যদি একটা কাজ করেই থাকে। আর ভুলই বা এমন কি ?

গৌরহরি ভালোমন্দ কোনো কথা কইলে না।

—আমার কথা তাকে জানিয়েছ ?

—জানিয়েছি।

—আসবে বলেছে ?

—তা তো জানি না। আসা না-আসার কথা তো তোমাকেই জানাবে।

বিনোদিনী একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার আখড়ার ঘর তৈরির কি হল ?

—কিছুই না।—গৌরহরি হাসলে।

বিনোদিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, তবে কি উড়ে উড়েই বেড়াবে ?

—মন্দ কি !

বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—ভিক্ষে দেবে না ?

বিনোদিনী নড়বার কোনো লক্ষণ দেখালে না। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উর্ধ্বোত্থিত দুই বাহু দিয়ে যেমন করে খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল। কতকটা অন্য-মনস্কভাবেই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, গৌরহরির নাকের সূক্ষ্মাগ্র-রসকলি, তার প্রশস্ত ললাটের তিলকরেখা, তার স্কন্ধবিলম্বিত কুঞ্চিত কেশদাম। তারাপদর সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। কাটা-ছাঁটা পোশাকে, চোখের চঞ্চলতায়, মাথার ছাঁটা চুলে তারাপদকে একটা তীক্ষ্ণতা দিয়েছে। দেখলেই মনে হয়, এর মধ্যে বাহুল্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু গৌরহরির সবই ঢিলাঢালা। মুখের দাড়িতে, মাথার চুলে, ঢিলা গৈরিক আলখাল্লায় তার কেমন হেলা-ফেলা ভাব। কিছুই তার প্রয়োজনের সীমান্তে এসে শেষ হয়নি। তারও পরে আছে। বাহুল্যকে সে বর্জন করেনি। তারাপদর ঠিক উল্টো। যতটুকু তার প্রয়োজন নিক্তির ওজনে মেপে ঠিক ততটুকুই সে বাইরের থেকে নিয়েছে। বাকি ছেঁটে ফেলে দিয়েছে। অনাবশ্যককে সে আর নিজের সঙ্গে জুড়ে রাখেনি। তার জন্যে তার মধ্যে একটা সক্রিয়তা এসেছে যা গৌরহরির মধ্যে নেই। দুজনের মধ্যে একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান ঘটিয়েছে।

বিনোদিনীর অন্যমনস্কতা দেখে গৌরহরি আপন মনে গুন গুন করে গাইতে লাগল, প্রেমপাথারে···

বিনোদিনীর চমক ভাঙল। বললে, তুমি চাষ-বাস কর না কেন ? সংসারী হও না কেন ?

গৌরহরি হেসে বললে, রাধারানী সে পথে আমাকে টানেননি বলে। যেদিন টানবেন···

—সে কবে ?

—সে খবর এখনও পাইনি ভাই। তুমি দুটি ভিক্ষে দাও, আমি চলে যাই।

বিনোদিনী মেঝেতে ভালো করে বসল। বললে, নদীর ধারের জায়গার কথা আমি জিগ্যেস করেছি। বললে পাওয়া যেতে পারে।

গৌরহরি সাগ্রহে বললে, পারে ?

—পারে। কিন্তু তোমাকে বোষ্টুমি আনতে হবে। অমন উড়ে উড়ে বেড়ালে চলবে না।

গৌরহরি হাসলে। বললে, দাঁড়ে বসতে হবে ?

—হ্যাঁ।—বিনোদিনীও হাসলে।

—নতুন দাঁড়ে বসতে যদি না পারি ? যদি পা টলে ?

—পা টললে চলবে না।

—পায়ের উপর জোর আছে ?

—জোর করতে হবে।

—তা কি করা যায়?

বিনোদিনী এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখ নাচিয়ে বললে, যায়।

—তুমি বলছ, যায় ?

বিনোদিনী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

গৌরহরি যেন শিউরে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদে বললে, রাধেশ্যাম ! রাধেশ্যাম !

সে আর্তনাদে বিনোদিনীর গায়ে চাবুকের মতো বসল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। গলা দিয়ে স্বর বের হল না। অপরাধীর মতো মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

—ভিক্ষে দাও বিনোদিনী, আমি যাই ?

বিনোদিনী সাড়া দিলে না। তেমনি করে কিছুক্ষণ বসে রইল। অকস্মাৎ গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে, নিতান্ত ছেলেবেলায় তুমি কবে কোন দিন কি বলেছিলে তাই সত্যি ? আর আমার সমাজ সংসার, স্বামী পুত্র, আমার ঘরকন্নার কাজ সব মিথ্যে ? এই কথা তুমি বলতে চাও ?

—তা তো বলতে চাইনি।

—তবে কি বলতে চাও ?

—কিছুই না। শুধু আমাকে ছুটি ভিক্ষে দাও, আমি যাই।

—তাই যাও।

বিনোদিনী ঘর হতে এক মুঠো চাল এনে গৌরহরির ঝুলিতে ঢেলে দিলে। গৌরহরি একটা কথাও বললে না। চাল নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। পাশের বাড়িতে আবার তার একতারার ঝঙ্কার উঠল ! আবার সেই গান, প্রেমপাথারে যে সাঁতারে···

বিনোদিনী আপন মনেই বললে, নিষ্ঠুর !

গৌরহরি এখনও পিছু পিছু ঘোরে, এ সে সইতে পারে না। কিন্তু কঠিন ঔদাসিন্যে দূরে চলে যাবে, এও তার অসহ্য। তার মনে বইছে ঝড়। আর গৌরহরি কি করে যে পাশের বাড়িতে গান গাইছে, গলা দিয়ে কি করে তার স্বর বেরুচ্ছে, এই ভেবেই সে আশ্চর্যান্বিত হল। এ যে পারে, সে না পারে কি ?

আজ সকালে কোনো কাজই আর সে করতে পারবে না। মিথ্যে চেষ্টা বিনোদিনী ঘড়া নিয়ে বড় পুকুরে স্নান করতে চলল।

তিন

দুপুরে এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর এখন রোদ উঠেছে। সেই রোদের আভা পড়েছে গাছের চিকন পাতায়, জলের ধারের ঘাসে ঘাসে, আর ময়ূরাক্ষীর তৃণহীন রাঙা মাটির উঁচু পাড়ে। আর পড়েছে দূর বিলে বন্যার যে রেখা দেখা যায় সেইখানে। কচি কচি ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে। তারই আড়ালে চিক চিক করছে জমির জল। কোথাও জমির কাটা আলের ফঁাক দিয়ে স্থড় স্থড় করে জল নামছে। কোথাও সাঁকোর নীচে গোসাপ করছে গর্জন। মাথালি মাথায় দিয়ে চাষী জমির ঘাস নিড়িয়ে তুলছে। তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছে ছপ্‌ ছপ্‌। রাহী লোক একলা পথ চলতে চলতে মনের আনন্দে গান ধরেছে, 'বৃন্দাবনের কালো শশী নদেয় এসে উদয় হল'। ময়ূরাক্ষীর ধার থেকে গাঁয়ের কোল পর্যন্ত মেয়ের সারি চলেছে। বামকক্ষে কলসী, ডান হাতখানি চলার তালে তালে দুলছে। সূর্যের আভায় পিতলের কলসী চিক চিক করছে। তালবনের তলে ক'টি রাখালছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে। মশ মশ শব্দে একদল গরু নব তৃণদল ভোজন করছে। ভোজনশ্রান্ত কোনো গাভী পরম স্নেহে নব বৎসের গাত্রলেহন করছে। দূরে রেলস্টেশনের কাচের জানালা রবিকরে ঝলমল করছে। সেদিকে চাওয়া যায় না। চোখে ধাঁধা লাগে।

একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাঁশী বাজিয়ে চলে গেল।

বিনোদিনীর যেন কি হয়েছে! সব সময়ে কে যেন তাকে ডাকছে। ট্রেনের বাঁশী শুনে ভরা কলসী কাঁখে নিয়েই বিনোদিনী মধ্যপথে থমকে দাঁড়াল। এত দূর থেকে শুধু ট্রেনখানিই দেখা যায়। যাত্রীদের বোঝা যায় না। ট্রেনখানি কোন্‌ অজানা দেশ থেকে আসছে সে জানে না। ভাবতেও পারে না। কোন্‌ নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তাও জানে না। ভাবতে গিয়ে তার বুকের ভিতরটা হু হু করে ওঠে। মনে হয়, এই কমলপুরের মাটি থেকে অকস্মাৎ সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এখানকার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। এ তার স্বদেশ নয়। তার গৃহ অন্য কোনো খানে। সেখানকার পরিচয় এখনও পায়নি, সত্যিকার গৃহের এবং সত্যিকার পরিজনের পরিচয়। কেবল তাদের পরিচয় পাওয়ার জন্যে মনে মনে ব্যাকুলতা এসেছে। কিছু ভালো লাগছে না—গৃহ না, পরিজন না, কিছু না। এই কদিন থেকে কি যেন তার হয়েছে!

পিছনের সাথীদের ঠেলায় এবং আগের সাথীদের টানে তার থামা চলল না। তাকে চলতে হল। ভিজে কাপড় পায়ে পায়ে যায় বেধে। তবু থামবার অবকাশ পেলে না। চলন্ত ট্রেনখানির দিকে ফিরে ফিরে চায়, আর পা পা চলে।

বাড়ি ফিরে দেখে হারাণ হাবল আর মেনীকে নিয়ে বিব্রত হয়েছে। হাবল বোধ হয় মারই খেয়েছে। উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে। বাপের কোলে উঠে মেনীর কান্না থেমেছে, কিন্তু এখনও থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। মাকে দেখে আবার ঠোঁট তার ফুলে উঠল।

হারাণ গর্জন করে বললে, এক পহর বেলা থাকতে গিয়েছিলি। সন্ধ্যে বাঁউরে গেছে এখন ফিরলি। কি করছিলি ?

দুম করে দাওয়ায় ঘড়াটা নামিয়ে বিনোদিনী বললে, পুকুরে কতখানি জল আছে তাই দেখছিলাম।

হারাণ অত বুঝলে না। বললে, নিবি তো এক ঘড়া জল। পুকুরের জলের খবরে তোর কাজ কি ?

বিনোদিনী কাপড় ছাড়তে ঘরের ভিতর গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে হবে না ? তাই দেখছিলাম।

হারাণ এতক্ষণে বুঝলে কথাটা রাগের। আর উত্তর দিলে না। মেনীকে নিয়ে গিয়ে দাওয়ায় নামিয়ে দিলে।

বিনোদিনী বেরিয়ে এসে বললে, এক পহর বেলা থাকতে আবার কখন গিয়েছিলাম ? এই তো গেলাম।

—এই গিয়েছিলি বই কি ! পাঁচটা মেয়ে এক ঠাঁই হলে আর তো ঘরের কথা মনে থাকে না ! তাতে ছেলেগুলো মরুক আর বাঁচুক।

বিনোদিনী কাপড় নিঙড়াতে নিঙড়াতে বললে, তোমরা আছ কি করতে ? একবার ছেলে ধরতে পার না ?

হারাণ গজ গজ্ করে বললে, তাই ধরব। আমার হয়ে চাষটা তুই করে দিয়ে আসিস।

বিনোদিনী হেসে বললে, তা পারি না না কি ?

—যাস না কাল থেকে।

—কি করতে যাব ? দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছ, জানো না দোজবরের বউ কি করে ?

—জানি। হাতে মাথা কাটে।

বলে গোলার তলা থেকে কোদালটা নিয়ে গোয়ালের পিছনে খানিকটা জায়গায় জল বসেছিল সেইটে ছাড়িয়ে দিয়ে এল। কদিন সে মাঠের কাজে ব্যস্ত ছিল, এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় পায়নি। আজ দৃষ্টি পড়েছে।

ফিরে এসে কোদালটা যথাস্থানে রেখে বললে, গোয়াল ঘরের পিছনটায় সোঁতা ধরেছিল দেখতে পাসনি? এক কোদাল মাটি ছাড়িয়ে দিয়ে এলে সোনার অঙ্গ ক্ষয় যেত না কি?

—ও সব আমি পারব না।

—কেন, পারবি না কেন?

—না, পারব না।

—ওঃ, নবাবপুত্তুর! খালি পাখনা মেলে বেড়াতে পারেন! দাঁড়া তোর রস আমি মারছি।

বিনোদিনীও চটে গেল। রুক্ষকণ্ঠে বললে, কি রস মারবে তুমি? ওরে, আমার কে রে! রস মারবেন! মারো না দেখি, কত বড় মরদ হয়েছ!

হারাণ গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এই দেখ, আমাকে রাগাস না বলছি। বলে, চাষার মুখ না 'আকার' মুখ। কি বলতে কি বলব তখন কেঁদে পার পাবি না।

তারপর গলা অপেক্ষাকৃত নামিয়ে বললে, আমার বলে কাঁকড়ায় ধানের গুছি খেয়ে ভুষ্টিনাশ করলে; আর উনি এলেন উস্তং ফুস্তং করতে।

—কি উস্তং ফুস্তং করেছি? তুমিই তো নেশাখোরের মতো চ্যাঁচাচ্ছ!

—আমি নেশাখোর?—হারাণ হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল,—ওই বোষ্টম কি করতে আসে শুনি? সকাল বেলায় কি অত কথা হয়? অ্যাঁঃ!

এই আকস্মিক আক্রমণে বিনোদিনী হতচকিত হয়ে গেল। সে যে কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

সে কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই হারাণ আবার বললে, আর ওই তারাপদর সঙ্গেই বা অত ফুস্থুর ফুস্থুর কিসের হয়? আমি কিছু বুঝি না, না? বড় নব্য ছোকরা পেয়েছিস, না? ধরতে যেদিন পারব সেদিন···

হারাণ তার বিশাল ছাতি ফুলিয়ে ভীষণ মূর্তিতে দাঁড়াল।

বিনোদিনী বারুদের মতো ফেটে উঠল।

কী বললে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। যাকে যা বলতে নেই সেই কথা! চাষার ঘরের চাষা! আমার বাপের বাড়ির লোক আসবে না? ওইটুকু

ছেলে তারাপদ তাকে সন্দ? তোমার গলায় দড়ি জোটে না? বুড়ো, ড্যাকরা! যম তোকে ভুলেছে? আস্পর্ধার কথা শোনো না!

বিনোদিনীর স্বর ক্রমশঃ উচ্চতর হতে লাগল। হারাণের বিশাল ছাতি সঙ্কুচিত হয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে থতমত খেয়ে কি যে বলবে ঠিক করতে পারলে না। তার গলার স্বর একেবারে নেমে গেল।

বললে, আহা, সন্দ হয় না। সন্দ হবে কেন, তা নয়। পাড়ার পাঁচটা লোকে পাঁচটা কথা বলে, সেইজন্যে বলছিলাম।

—কোন্ হারামজাদী কি বলে শুনি?

বিনোদিনীর রণরঙ্গিণী মূর্তি।

হারাণ ভয় পেয়ে গেল। বললে, আহা, বলবে কেন, বলে না ·কেউ। বললে তার জিভ ছিঁড়ে ফেলব না? আমি হারাণ মোড়ল। লাঠি ধরলে দুশো লোকের মণ্ডড়া নিতে পারি। আমাকে ডরায় না কে? বলুক না কে কি বলবে তোর সম্বন্ধে।

হারাণের গলা আবার চড়ল। বুকের ছাতি আবার বড় হল। পেশীগুলো থরথর করে নাচতে লাগল।

বিনোদিনী খানিকটা নরম হল। আঁচলে চোখ মুছে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, তবে বললে কেন ওকথা?

তার চোখের জলে হারাণের মন ভিজে গেল। বললে, আমি বললাম? ভালো রে! তোর আর দোষ কি বল? আমার অদৃষ্টই মন্দ। তা যদি না হবে, তবে সন্ধ্যেবেলায় তুই চোখের জল ফেলে আমার অকল্যেণ করিস!

বিনোদিনী চোখের জল মুছে মেনীকে কোলে তুলে নিলে। সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে তুলসীতলায় দেখিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে। উঠে দেখে হারাণ তার দিকে চেয়ে হাসছে।

—হাসছ যে!

বিনোদিনী মাথার ঘোমটাটা সলজ্জভাবে একটু টেনে দিলে।

—হাসিনি।—হারাণ মৃদুমৃদু হাসতে হাসতে বললে,—তুলসীতলার পিছনে এই সন্ধ্যেমণির ঝাড়টা কে পুঁতলে তাই ভাবছি।

—কেন, কি দোষ হল কি?

—হয়নি কিছুই।

—তবে বলছ যে?

হারাণ আর একবার হাসলে! বললে, পিদিমটা নামিয়ে যখন তুই পেন্নাম করে উঠলি, তখন পিদিমের আলো পড়েছে তোর মুখে। আর উদিকে ওই সন্ধ্যেমণির ফুল। ভারী বাহার খুলেছিল রে! তাই দেখছিলাম।

বিনোদিনীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল। যেতে যেতে বললে, তাই দেখ। রস দিন দিন বাড়ছে কি না!

হারাণ হেসে বললে, রসের আর দোষ কি বল! তোকে দেখলে রস আপনিই বাড়ে।

—আহা! রসের নাগর!

হারাণ খুশী হয়ে ভাঙা গলায় গান গাইতে গাইতে গরু বাঁধতে গেল। সে রাত্রে পাড়ার লোক ওদের আর কলহ শুনতে পেলে না। বরং হারাণের ভাঙা গলার হাসি শুনে পাশের বাড়ির বউরা পর্যন্ত মুখ টিপে হাসলে।

সকাল বেলায় হারাণ গরুগুলোকে বাইরে বার করে খোল-শানি দিলে। ঘরের মধ্যে কেবল মুখভদ্রাটা রইল। মাঠে যাবার সময় বিনোদিনীকে বলে গেল, মুখভদ্রাটা বোধ হয় বাদলিয়েছে রে! ওকে আর বার করলাম না। গোয়ালটা ভালো করে পরিষ্কার করে দুআঁটি খড় বিছিয়ে দিস।

খানিকটা গিয়ে আবার ঘুরে এসে বললে, আর দেখ, নবদ্বীপকে একবার খবর পাঠাস গাইটাকে দেখে যাবার জন্যে।

চিন্তিত মুখে বিনোদিনী বললে, সে কি মাঠে যায়নি?

—বোধ হয় গেছে। তবু একবার খবরটা নিস।

—আচ্ছা।

বিনোদিনীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ বাড়িতে সে বধূরূপে আসার অনেক পরে মুখভদ্রা হয়েছে। নিজের হাতে বাছুরকাল থেকে তাকে সে লালন করেছে। তারপরে এই সংসারে গরুটি অনেক বৎস এবং অনেক দুগ্ধ দান করেছে। বিনোদিনীর হাত থেকে অনেক সেবা নিয়েছে। অনেক রকমে তাকে নিজের স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। আজকে সে হাবল মেনীর মতো এই সংসারেরই একজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে বড্ড গোমড়ক আরম্ভ হয়েছে। এই গ্রামেরই :দশ-বারোটা গরু এরই মধ্যে মারা গেছে। কে জানে ভদ্রা কি করে ভালো হবে।

বিনোদিনী সব কাজ ফেলে গোয়ালে গেল। তাকে দেখে ভদ্রা বড় বড় করুণ চোখ মেলে চাইলে। একবার যেন দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে। পারলে না।

থর থর করে কাঁপতে লাগল। তার চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

বিনোদিনী গিয়ে তার গায়ে মাথায় গলায় পরম স্নেহে হাত বুলোলে। ভদ্রা মাথাটি তার কাঁধের উপর রেখে চোখ বন্ধ করলে।

—কি হয়েছে রে? অসুখ করেছে? ও ভালো হয়ে যাবে। ভয় কি? নবদ্বীপ এসে ওষুধ দিলেই সেরে যাবে।

গরুটা যেন সে কথা বুঝতে পারলে। কান দুটো নেড়ে জানালে।

—উঠতে পারছিস না? থাক আর উঠতে হবে না। আমি হাতে করে তোর জায়গাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তারপর খড় বিছিয়ে দোব, তোর গায়ে সেঁক দোব, কত কি করব? দেখ না, এক্ষুনি ভালো হয়ে যাবি।

বাইরে বাছুরটা একবার হাম্‌লে উঠতেই গাইটা চকমক করে চাইলে।

—বাছুরটার জন্যে মন কেমন করছে? তা কি করবি বল? তোর যে অসুখ করেছে। তোর দুধ তো বাছুরের খাবার উপায় নেই। তা হলে তারও যে অসুখ করবে। তুই ভালো হ। তারপর তোকে তার কাছে বেঁধে দোব। তখন তার গা চাটিস, আদর করিস, যা যা মন চায় তাই করিস। আজকে এমনি করে পড়ে থাকতে হবে। আর জল পাবি না এক ফোঁটাও। তা মনে থাকে যেন। হ্যাঁ!

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
পায়েতে লাল পাগড়ি···

—ঘুরতে হবে গো। হাত জোড়া আছে।

—তা হোক, আমরা একটু বসব।

অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর। ভারী গলা, কিন্তু মিষ্টি। লোকটাকে দেখা যাচ্ছিল না। দেখার কোনো ঔৎসুক্যও নেই। এমন কত ভিখারীই প্রত্যহ আসছে। বিশেষ এই আকালের বৎসরে তাদের যেন ভিড় লেগেছে। গৃহস্থ ভিখারী বিদায় করতে করতে বিব্রত হয়ে.উঠেছে। তবু ভিখারী তাড়াতে নেই। বিনোদিনী মনে মনে বললে, আ মোলো। যেতে চায় না!

একটি পুরুষ এবং একটি মেয়ে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল। সঙ্গে ডুবকী আর একতারা:

ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
পায়েতে লাল পাগড়ি, মাথাতে শোনার নূপুর।

দেখলাম এক জিন শহরে, বাঁঝা নারীর পুত্র মরে,
তা দেখে অন্ধ আতুর কেঁদে হয় আকুল।
(সেথা) পিতার শোকে পুত্র হাসে, এক সাপে খায় তিন ময়ূর ॥
শকুন খাবার আস্বাদে মড়ি ধ্যেয়ায় আহ্লাদে,
তা দেখে নিত্য মানুষ উঠল আশমানে।
তিন দিনের অগ্রভাগে বাঘ ধরে খায় বাঘাম্বর ॥

বড় মিষ্টি গলা। স্ত্রী পুরুষ দুজনে যেন দুটি মানিকজোড়। বিনোদিনী বাইরে এল। হাত ধুয়ে এদের দুটি ভিক্ষা দিয়ে আবার বরং গোয়ালের কাজে লাগবে।

কিন্তু বাইরে আসতেই

—এ কি, ললিতা! ওমা, কি ভাগ্যি!

ললিতা খিল খিল করে হেসে ছুটে এসে বিনোদিনীকে জড়িয়ে ধরলে।

মোটা গলার পুরুষটি গম্ভীরভাবে বললে, আমিও আছি। একলা ললিতাকে ডাকলে হবে না।

বিনোদিনী আধঘোমটার ভিতর দিয়ে কৌতুকচঞ্চল চোখে চেয়ে শুধু একটু হাসলে। রসময়কে সে কখনও দেখেনি। কিন্তু বুঝতে তার বাকি রইল না, ওই রসময়। ওর পাশ দিয়ে ললিতার কোমর জড়িয়ে ধরে বড় ঘরের দিকে আনবার সময় মৃদুকণ্ঠে বললে, গান গাওয়া হল। এইবার ভিক্ষে নাও, নিয়ে চলে যাও।

রসময় হেসে বললে, তাই বটে! আমার চলে যাবার অদৃষ্টই বটে।

ললিতা হেসে বললে, না না, চলে যাবে কেন? আমি যতক্ষণ না ফিরি ওই-খানে দাঁড়িয়ে থাক।

রসময় বললে, সেই রকম কি কথা ছিল?

—কথা আবার কি? যখন যেমন, তখন তেমন।

—ও।

বিনোদিনী ঘরের ভিতর থেকে একখানা আসন এনে দাওয়ায় বিছিয়ে দিলে। ললিতাকে বললে, আমার মনটা বড় ভালো নেই ভাই, ভদ্রা গাইটার অসুখ।

রসময় বসতে যাচ্ছিল, উঠে পড়ে বললে, তবে আর তোমার সয়ার বাড়িতে বসা অদৃষ্টে নেই। আমি বরং গোয়াল ঘরেই বিশ্রাম করিগে।

বিনোদিনী গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা, সে আবার কি কথা!

ললিতা রসময়ের দিকে চেয়ে হেসে বললে, তাই যাও। দেখগে কি হয়েছে।

বিনোদিনীকে বললে, খুব ভালো গরুর চিকিচ্ছে করে। ওদিকের পাঁচখানা গাঁয়ে গরুর অসুখ হলে ওকেই ডাকে। পাসকরা ডাক্তার ওর কাছে কিছুই নয়।

বিনোদিনী আশ্বস্ত হয়ে বললে, তাই বুঝি!

—হ্যাঁ। গুরুর আজ্ঞে আছে, খেতে বসেও যদি গরুর রোগের কথা শোনে, খাওয়া ফেলে তখনি উঠতে হবে। এমন! তাই তো বসতে গিয়েও বসতে পেলে না।

বিনোদিনী বললে, অনেক দিন পরে তোকে পেয়েছি যখন, তখন দশ দিনের মধ্যে আর ছাড়ছি না।

ললিতা বিব্রতভাবে বললে, তা পারব না ভাই। তবে এই বেলাটা থাকতে পারি।

—মোটে! তবে থাকতে হবে না যা।

ললিতা আরও একটা বেলা থাকতে রাজি হল এবং বহু সাধ্য-সাধনায় কাল সকালে বিদায় নেবার আবেদন মঞ্জুর হল। হাবল এবং মেনী ইতিমধ্যেই কোথা থেকে এসে ললিতামাসীর কোল দখল করে নিয়েছে। ওদের জন্যে ললিতা তাদের গ্রামের বিখ্যাত ফেনি বাতাসা এনেছিল। ছেলেদের দুজনের হাতে দুখানা দিয়ে বিনোদিনী বাকিগুলো ঘরের মধ্যে শিকেয় তুলে রাখল।

বললে, চল্। সকাল সকাল চান করে আসি। এসে রান্না চড়ানো হবে।

—এত সকালে?

—তা হোক।

দুজনে তেল মেখে স্নান করতে গেল।

পরস্পরকে পেয়ে রসময়ের কথা ওরা ইতিমধ্যে ভুলেই গিয়েছে। রসময় ভদ্রাকে ভালো করে দেখে মাঠে গিয়েছিল ওষুধ তুলতে। সেই ওষুধ নিয়ে এসে ভদ্রাকে সে নিজের হাতে খাওয়ালে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ওষুধ ধরছে কি না।

মন হারাণেরও ভালো ছিল না। মাঠে নিতান্ত না গেলে নয়, তাই গিয়েছিল। কিন্তু মন পড়ে ছিল ভদ্রার দিকে। কোনো রকমে হাতের কাজ সেরে সে সকাল সকাল ফিরে এল? বাড়িতে মেয়েরা তখন স্নান করতে গিয়েছে। হাবল আর মেনী গোলার নীচে বসে তখনও বাতাসা দুখানা লেহন করছিল। কিন্তু হারাণের বুদ্ধি এবং দৃষ্টি কোনো কালেই সূক্ষ্ম নয়। অত তার চোখে পড়ল না। সে হন্তদন্তভাবে সটান গোয়ালঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখে একটা অপরিচিত লোক দরজার দিকে

পিছনে ফিরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর নিবিষ্টচিত্তে ভদ্রার দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে।

—কে ?

—আমি।

রসময় একাগ্রমনে রোগের গতি পর্যবেক্ষণ করছিল। পিছন ফিরে চাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলে না।

তার উত্তর শুনে হারাণ মনে মনে বললে, বেশ !

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে কি হচ্ছে ?

এবার রসময় পিছন ফিরে চাইলে। প্রশ্নকর্তার দীর্ঘায়তন দেহ এবং মসীকৃষ্ণ বর্ণ দেখেই রসময় চিনলে যে, এই হারাণ। সে চিরকালই একটু পরিহাসপ্রিয়। বিশেষ করে হারাণের চেহারা দেখেই তার পরিহাস করার প্রবৃত্তি বলবতী হল।

সেও খুব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কে ?

—বটে !—এক পা এগিয়ে এসে হারাণ জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে কি দেখছিলে ?

—আগে গরু দেখছিলাম, এখন তোমাকে দেখছি।

আশ্চর্যের বিষয় হারাণ রাগলে না। বললে, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ। গরুটার অসুখ।

—তাও দেখেছি। ওষুধও দিয়েছি।

হারাণ উৎসাহিত হয়ে উঠল। লোকটা কে, আর সে কথা জানবার কৌতূহলও হল না, জানবার প্রয়োজনও বোধ করলে না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন দেখলে ?

—ভালো হয়ে যাবে।

—যাক। তুমি সরে এস।

রসময় গোয়ালের প্রবেশপথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। তার গা ঘেঁষে তাকে ঠেলা দিয়ে হারাণ ভিতরে গেল। গরুটাকে একটু ভালোই বোধ হচ্ছে বটে। এখনও অবশ্য দাঁড়াতে পারছে না, তবে তেমন কাঁপুনি আর নেই। দু-একটা ঘাসও অল্প অল্প করে দাঁতে কাটছে। বুঝলে, সত্যই ভয় অনেকটা কেটেছে। অপরিচিত লোকটি চিকিৎসা ভালোই করে। কিন্তু কে সে ? কোথাকার লোক ? কেই বা তাকে ডাকলে ? যেই হোক, ভদ্রাকে বাঁচানোর জন্যে হারাণের মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব এল। আবার তখনই মনে হল, টাকা-পয়সা লাগবে না কি ? তা হলেই হয়েছে ! হারাণের কাছে একটি পয়সা নেই। আবার ধার করতে বেরুতে হবে।

ধারই বা পাবে কোথায়? এ গ্রামে এখনও ধান পাওয়া যায়, চাল পাওয়া যায়। কিন্তু পয়সা একেবারেই দুর্মূল্য। লোকে দৈনন্দিন দোকান বাজার, নুন তেল, চাল দিয়েই করে, পয়সা দিয়ে নয়। হঠাৎ চাইলে একটি পয়সা কেউ বা'র করতে পারবে না।

বিনোদিনীর উপর রাগ হল। কোনো আক্কেল যদি ওর থাকে! বলা নেই, কওয়া নেই, একটা অজানা লোককে এনে গরুর চিকিৎসা করালে, এখন পয়সা কোথায় পাওয়া যায় বল দেখি? কেন, নবদ্বীপ কি দোষ করেছিল? তাকে ডাকলে একটা পয়সাও লাগত না। গরুর চিকিৎসায় তার কাছে কেউ লাগে? হারাণ আর পারেও না। কত ঝঞ্ঝাট সে পোহাবে? কাঁকড়ায় ধানের গুছিগুলো কাটছে। তার 'পরিন্দে' য়োগাড় করতে এই ক'দিনে তার পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল। কত কষ্টে পাওয়া গেল। তা যদি বা পাওয়া গেল, তো এই আবার এক ঝামেলা। মানুষ এত সইতে পারে!

চুলোয় যাক। এখন একটা মানুষ এসেছে, তাকে এক কলকে তামাক তো সেজে খাওয়াতে হবে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? বাড়ির ভিতরে এসে দেখে লোকটা নির্জন বাড়িতে দিব্য একখানি আসন বিছিয়ে বসে আছে। নিজেই কলকে বা'র করেছে, তামাক বা'র করেছে, চকমকি ঠুকে আগুন করেছে। তারপর নিশ্চিন্ত মনে পা দোলাচ্ছে, আর তামাক খাচ্ছে।

মনের বিস্ময় মনেই চেপে হারাণ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা?

—বৈষ্ণব।

—এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল?

—এইখানেই।

হারাণ কিছুই বুঝলে না। বেশী কথা জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হচ্ছে না। পাছে টাকার কথা এসে পড়ে। শুধু জিজ্ঞাসা করলে, মশায়ের নিবাস?

—কাঞ্চনপুর।

হারাণ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোন্ দেশ?

রসময় হাসি চেপে বললে, কেঁচুর।

—ও। এই কেঁচুর!

হারাণ কেঁচুরের উদ্দেশে আঙুল দিয়ে দেখালে।

দুজনেই চুপ করে রইল। আর কি কথা বলা যায় ভেবে না পেয়ে হারাণ এদিক ওদিক চেয়ে আত্মগতভাবে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, এরা কোথায়?

—আমাদের এরার সঙ্গে চান করতে গিয়েছেন।

হারাণ বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। ইনি একা আসেননি, সঙ্গে স্ত্রীও এনেছেন! কিন্তু কেঁচুরে তাদের কে আছে? আবার জাতি বললে বৈষ্ণব। হারাণ নিজের বুদ্ধিহীনতার সম্বন্ধে সর্বসময় সচেতন। ভাবলে, কাজ নেই ঘাঁটিয়ে। বিনোদিনী এসে যা হয় করবে। সে এখন কোনো ছলে বাইরে যেতে পারলে বাঁচে।

এই ভেবে সে উঠতে যাচ্ছিল এমন সময় জলভরা কলসী কাঁখে নিয়ে ভিজে কাপড় সপ সপ করতে করতে বিনোদিনী আর তার পিছনে ললিতা।

হারাণের ওঠা হল না। সে হাঁ করে অবাক হয়ে ললিতার দিকে চেয়ে রইল।

ললিতার রঙ বিনোদিনীর মতো অতখানি চিকন নয়। লম্বাতেও ছোট এবং স্থূল। কিন্তু বেশী স্থূল নয়। পরিপুষ্ট আঙুরের মতো। যেন রসে টস টস করছে। চোখ দুটি টানা টানা, বড় বড়। যেন সব সময়েই হাসছে। ছেলেপুলে না হওয়ায় ঝঞ্ঝাট কিছু নেই। সেজন্যে এখনও ছেলেমানুষি যায়নি। সেই সরসতা ও সরলতার চিহ্ন তার মুখে চোখে কথায় বার্তায় রয়েছে।

বললে, কি গো মোড়ল মশাই, চিনতে পারছ?

হারাণ এক গাল হেসে বললে, চিনতে আবার পারব না কেন? খুব চিনতে পারছি। দেখা মানুষ কি চিনতে ভুল হয়?

—কে বল দেখি?

—হুঁঃ! কে আবার? তেমন মনে কোরো না আমায়। বলে, চিনতে পারছি না। হুঁ!

বিনোদিনী তাকে উদ্ধার করলে। বললে, ও ললিতা।

ললিতাই বটে! এতক্ষণে মনে পড়ল। হারাণ তাকে অনেক দিন পূর্বে দেখেছিল। মুখখানি চেনা চেনা বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক করতে পারছিল না। তবু অন্য স্ত্রীলোকের কাছে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে তার ইচ্ছে হল না।

জাঁক করে বললে, চিনেছি গো চিনেছি। আমাকে তেমন চাষা পাওনি! বলে, ললিতাকে চিনতে পারব না! সেই পানের ভেতর তেলাপোকা পুরে দিয়েছিলে মনে নেই? খেয়ে বমি করে মরি আর কি!

ললিতা হেসে বললে, খুব বুদ্ধিমান! আর সেই পিঁড়ির নীচে সুপুরি, মনে নেই?

হারাণ হো হো করে অট্টহাস্য করে ঘর ফাটিয়ে দেবার মতো করলে। বললে, মনে আবার নেই? খেতে বসে হুড়মুড় করে পিঁড়িসুদ্ধ পড়লাম দাওয়া থেকে নীচে।

বাবাঃ ! কি জ্বালানটাই জ্বালিয়েছ। এবারে তার সুদসুদ্ধ শোধ তুলতে হবে, মনে থাকে যেন। বলে বিনোদিনীর দিকে চাইলে।

বিনোদিনী হেসে বললে, আমি কি করতে তুলতে যাব ? তুমি তোলগে।

—আহা ! এটির ভার যেন আমার উপর রইল। আর ওই বোষ্টম ঠাকুরটির ?

বিনোদিনী বললে, বোষ্টম ঠাকুর তো ঠাকরুন নিয়ে কালই পালাতে চায়।

হারাণ দাওয়া থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নীচে পড়ল। কোমর বাঁধতে বাঁধতে বললে, ফাটাফাটি হয়ে যাবে তা হলে। আমি ডাকসাইটে হারাণ মোড়ল। লাঠি ধরলে দুশো লোক ভাগড়া হয়। আমার বাড়ি থেকে ঠাকরুন নিয়ে যাবে এত বড় আস্পর্ধা ? একটি মাস থাকতে হবে, তবে ছুটি। যাক তো দেখি, কে ঠাকরুন নিয়ে যাবে ?

রসময় হেসে বললে, আর খাতিরে কাজ নেই। এখনি তো গোয়ালঘরে দুলাঠি বসিয়েছিলে। চোখ দেখে ভয়ে মরি।

হারাণ হো হো করে হেসে বললে, সেই রকমই গতিক বটে ! আমি ভাবলাম গরুচোর।

বলে হারাণ যত হাসে, বিনোদিনী আর ললিতা তত হাসে। হাসি আর থামে না।

রসময় অপ্রস্তুত হয়ে বললে, ভালো করতে গিয়ে শেষটায় এই বদনাম ! মন্দ নয় !

বিনোদিনী হেসে বললে, তা ও কি করে জানবে বাপু ! ভদ্দর লোক এসে কখনও গোয়ালঘরে বসে থাকে ?

ললিতা রসময়ের দিকে একটা কটাক্ষ হেনে হারাণকে বললে, দিলে না কেন দুঘা ?

রসময় বললে, তাতে আমার আর ক্ষতিটা কি ? বসে বসে ছমাস ঘি রুটি খেতাম।

হারাণ বললে, তাতে আমিই কাতর না কি ? তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে ঘরে গমেরও অভাব নেই, ঘিয়েরও অভাব নেই। খাও না কেন কত খাবে ?

তারপর বিনোদিনীর দিকে চেয়ে বললে, ওই জালার ভেতর থেকে রামশাল চাল আছে বা'র কর। আর ঘাটজালটা দে তো, দেখি পুকুরে দুটো মাছ যদি পাওয়া যায়। আর হ্যাঁ, তুমি এক কাজ কর হে ভায়া, হাতে মুখে জল দিয়ে দুটো গরীবের ঘরের মুড়ি খাও।

বিনোদিনী জলখাবারই বা'র করছিল। চিড়ে ভাজা, ছোলা ভাজা, নারকেল, আদার কুচি, কাঁচা লঙ্কা, শশা, বড় জামবাটিতে বাটিভরা মুড়ি, গুড়, দই।

হারাণকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খাবে না?

—একটু রাখ। আগে পুকুরে একটা ক্ষেপ দিয়ে আসি।

—বেড়েছি যে!

—আচ্ছা তা হলে দে। বলে হারাণ ঘাটজালটা নামিয়ে রেখে খেতে বসল।

বিনোদিনী ললিতাকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। কেউ কারও হাতে খাবে না। দুটো উনোনে দুজনের রান্নার ব্যবস্থা হল। ললিতারা বৈষ্ণব হলেও গৃহস্থ বৈষ্ণব। মাছটা খায়।

ললিতার দিকে চেয়ে চেয়ে বিনোদিনী বললে, ছেলেপুলে হলে মেয়েমানুষের আর কিছু থাকে না। তুই বেশ ছেলেমানুষটি হয়ে আছিস।

—আর তোরই বা গেল কি? বেশ তো দেখছি।

—তোর মতন?

—আমার চেয়ে ভালো।

বিনোদিনী অবিশ্বাসসূচক চুমকুড়ি কাটলে।

ললিতা হেসে বললে, ভয় হয় তো রাখিস না ভাই। ধুলো পায়েই বিদেয় করে দে।

বিনোদিনী পালটা জবাব দিলে, ভয় হত যদি আমার মিনষের তিনকাল গিয়ে এককালে না ঠেকত।

—তাই বুঝি?

বিনোদিনী হাসলে। কিন্তু ললিতা হাসতে পারলে না। বিনোদিনীর পাশে হারাণকে সত্যিই বেমানান লাগে। জোয়ান হলে কি হবে, হারাণের মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে স্পষ্ট। বিয়ের সময় হারাণকে এতটা বুড়ো লাগেনি। এই কবছরে তার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। মাথার চুল পেকেছে অনেক। আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি তো পেকে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। হাসলে দাঁতের মূল পর্যন্ত দেখা যায়। আর ওই রূপ! বিনোদিনীর বাপের কি চোখ ছিল না?

একটু পরে ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কবে এসেছিল?

বিনোদিনী অকস্মাৎ সতর্ক হয়ে গেল। এতদিন হত না। কিন্তু হারাণের মুখে সেদিনের ইঙ্গিতের পর থেকে তার নিজের মনেই যেন আর বল পাচ্ছে না।

বিনোদিনী নিস্পৃহভাবে বললে, কদিনই এসেছিল। এই তো সেদিনও এসেছিল ভিক্ষে করতে।

—আমার সম্বন্ধে কি বললে ?

—কিচ্ছু না।

—ভালো মন্দ কোনো কথাই না ?

বিনোদিনী ঘাড় নাড়লে।

একটু চুপ করে থেকে ললিতা বললে, অন্যায়টা কি করেছি ? ওই বা ওদের কাছে কি অপরাধটা করেছে ? সেই গেঁজেলটার কাছে পড়ে পড়ে সারা জনম মার খেলেই ভালো হত ? মেয়েমানুষ হয়েছি বলে আমার সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই ?

—মারত বুঝি ?

ললিতা শিউরে উঠে বললে, সে কি মার ! মানুষ গরু-মোষকে অমন করে ঠেঙায় না।

—কেন, তোর অপরাধ ?

—কিছুই না।—ডালের হাঁড়িতে একবার কাঠি দিয়ে ললিতা বললে,—অপরাধ শুনবি ? ও ভাই একদিন আমাদের বাড়ি ভিক্ষে করতে এসেছিল।

—রসময় ?

—হাঁ। আমি ভাই ওর সঙ্গে দুটো কথা বলেছিলাম। এই অপরাধ ! তা কতদিন পরে দেখা, দুটো কথাও কি বলতে পাব না ভাই ? বিয়েই না হয় করেছি, মন তো আর পাথরে বাঁধিনি !

বিনোদিনী চুপ করে বসে রইল। সে যে কি ভাবছিল তা সেই জানে, আর জানে তার অন্তর্যামী। ললিতার মতো সকল কথা অকপটে মুখ ফুটে বলবার তার উপায় নেই। ললিতার সমাজে বাধে না। ললিতা রসময়কে নিয়ে বড় রাস্তার উপর দিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। কিন্তু বিনোদিনী পারে না। তার মুখ বন্ধ, পথ বন্ধ, বুকও বন্ধ ! সে নিঃশব্দে নিবিষ্ট মনে রাঁধতে লাগল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, দাদাকে কেমন দেখলি ?

—বেশ।

—খুব রোগা হয়ে গেছে ?

—একটু।

ললিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, কে তাকে দেখবে, কেই বা যত্ন-

করবে! মাও নেই যে, কাছে বসে পেট ভরে দুটো খাওয়াবে! হয়তো দুবেলা খাওয়াই হয় না!···ঘর তো আগেই পড়ে গেছে। নতুন আখড়া তোলবার কথাটথা কিছু বললে!

—এইখানে একটু জায়গা চাইছিল নদীর ধারে।

—তাই দে না যোগাড় করে। তবু তোর চোখে চোখে থাকলে একটু নিশ্চিন্তি থাকি।

বিনোদিনী ঘাড় নাড়লে। বললে, আমার তো জায়গা নয় ভাই!

ললিতা বিনোদিনীর অসম্মতির সত্যকার কারণটা বোধ হয় বুঝলে। বুঝে চুপ করে রইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলে না। কৌতূহলই প্রবল হল। বিনোদিনীর বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখবার লোভ সামলাতে পারলে না।

চোখ নাচিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে ললিতা বললে, দাদাকে দেখে তোর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল না? কিছু বললে না সে?

বিনোদিনীর বুকের স্পন্দন থেমে যাবার মতো হল। শুষ্ককণ্ঠে বললে, বলবে আবার কি?

—কিছু বললে না? সেই মাধবীলতার অন্ধকার কুঞ্জের মধ্যে বসে জামরুল খাওয়া, কিংবা···

বিনোদিনী হাসলে। কিন্তু খুব প্রসন্নভাবে নয়।

ললিতা ছাড়লে না। বললে, সেই গানখানা গাইলে না, 'রাই জাগো, রাই জাগো'?

মুখ নামিয়ে বিনোদিনী বললে, রাই মরে গেছে। আর জাগবে না।

—তা কি বলা যায়?

—যায়।

বিনোদিনীর উনানটা নিবে গিয়েছিল। উবু হয়ে ফুঁ দিতে লাগল। ধোঁয়ায় তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ললিতা গান ধরলে, 'ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদে'।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বিনোদিনী বললে, যাঃ!

ললিতা বললে, তুই যদি ভাই বোষ্টম হতিস···

বিনোদিনী অকস্মাৎ যেন শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি বললে, যাঃ! ও আবার কি অলক্ষুণে কথা!

—অলক্ষুণে কিসের?

—হ্যাঁ অলক্ষুণে। আমি গেরস্থ ঘরের বউ। ছেলেপিলের মা। ওতে আমার সংসারের অকল্যাণ হয়।

ললিতা ওর মুখ দেখে চুপ করলে। আর কথা বাড়াতে সাহস করলে না। দুজনেই নিঃশব্দে আপন আপন কাজ করতে লাগল।

একটু পরে রসময়কে নিয়ে হারাণ লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত।

—ললিতা সখী, এখনি হয়েছিল।

ললিতা আর বিনোদিনী হারাণের কথার ধরন শুনে দুজনেই শশব্যস্ত বাইরে এসে দাঁড়াল। রসময়কে হারাণ তখন একখানা শুকনো কাপড় দিয়েছে। সেইটে পরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রসময় তখন হাঁফাচ্ছে। তার চোখ রক্তবর্ণ। শরীর অবসন্ন।

হারাণ ওদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ময়ূরাক্ষী পার হতে গিয়ে দামে পা আটকে গিয়েছিলেন আর কি! বেশ এক পেট জলও খেয়েছেন। আমি কি আর তুলতে পারি? আমাকেই ধরে ডুবিয়ে দিতে চায়। শেষকালে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে কাপড় ফেলে দিই। তাই চেপে ধরে। তবে আমি টেনে তুলি। তোমার রসময় বীরপুরুষ বটে!

বলে হারাণ দুম দুম করে বীরদর্পে ঘরের মধ্যে কাপড় ছাড়তে গেল।

সেইখান থেকে বললে, গরম দুধ আছে তো? তাই একটু দাও। ভায়া আমার নাতোয়ান হয়ে গেছেন।

ললিতা রসময়ের ভিজে চুলগুলো আপনার শুষ্ক অঞ্চল-প্রান্ত দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, কোনো ক্ষমতা নেই!

রসময় পাতলা একটু হাসলে। গরম দুধ আর সে খেতে চাইলে না। নিজের শারীরিক দুর্বলতায় মেয়েদের সামনে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তখনই ঝেড়ে উঠে গোয়ালঘরে ভদ্রা গাইটাকে একবার দেখে এল। গরুটা অনেকটা সেরে উঠেছে। শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছিল। হারাণকে দেখে উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ভয়ের আর কোনো কারণ নেই। সেখান থেকে এসে দুজনে আহারে বসল। আহারের ব্যবস্থা ভালোই হয়েছিল। ঘাটজালে বেশ বড় মাছই পাওয়া গিয়েছিল।

ললিতা কিছুতেই পরের দিন বিনোদিনীর বাড়িতে থাকত না একটা দিন রইল, ওই যথেষ্ট। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে থাকতে হল।

সে একটা দুর্ঘটনা।—

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ললিতা আর বিনোদিনী রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল। হারাণ আর রসময় বড় ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প করছিল। হারাণের বাড়ি কুটুম্ব এসেছে শুনে গ্রামের আরও পাঁচজন এসেছিল। রসিক ছিল, নবদ্বীপ ছিল, সদানন্দ, বৃন্দাবন, আরও অনেকে ছিল। বসে বসে গল্প করছিল আর তামাক পোড়াচ্ছিল। একটা কেরোসিনের ল্যাম্প অদূরে জ্বলছিল। সাবুইএর বেণী পাকিয়ে তাই গোল করে মুড়ে মোড়া তৈরি করা আছে। তারই এক একটা এক একজনের আসন।

নবদ্বীপ যেটায় বসে ছিল, সেটা হঠাৎ একটু নড়ে উঠল। সে চমকে লাফিয়ে উঠল। তা দেখে আর সবাই। তাড়াতাড়ি আলো আনা হল।

একটা সাপ !

হাত তুই লম্বা। বেঁটে, লেজ নেই। একটা শাবলের মতো মোটা। আলো দেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নবদ্বীপ তো বাঁশ নিয়ে তাকে মারে আর কি ! এখনই তাকে খেয়েছিল। ও সাপে খেলে আর তাকে বাঁচতে হত না। কিন্তু হারাণ হাঁ হাঁ করে উঠল। রসিক সদানন্দ তার হাত থেকে বাঁশ কেড়ে নিল। ও সাপ কি মারতে আছে ? বাস্তু !

হারাণ দূর থেকে গড় হয়ে তাকে প্রণাম করলে। সাপটা আস্তে আস্তে বাড়ির পিছন দিয়ে চলে গেল।

বৃন্দাবন হেসে বললে, লবদ্বীপের মাথা খারাপ হয়েছে। ওই সাপ মারে না কি ?

—না, সাপ আবার মারে না ! এখনই আমাকে খেয়েছিল !

রসিক বললে, দেখলে না ন্যাজ নেই ? খুব কম হলেও সাপটা তুশো বছরের পুরোনো। বাস্তু সাপ কি মারে ? গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।

কিন্তু সেই সাপটাকেই হারাণের বাড়ির সদর দরজার সামনে মৃত অবস্থায় পরদিন সকালে দেখা গেল। সেই সাপটা কি না ঠিক নেই। তবে সেই রকমেরই দেখতে। এবং এটারও লেজ নেই। সেখানে অনেকগুলো ইট পড়ে রয়েছে। বোধ হচ্ছে সেই রাত্রে, কিংবা পরদিন খুব ভোরে কেউ তাকে ইট ছুঁড়ে মেরেছে। সাপের মুখটা সদর দরজার ফাঁকে ! বোধ হয় ভিতরে আসবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। কিন্তু কে মেরেছে তার সন্ধান হল না। কেউ বললে, চৌকিদারের কাণ্ড। রাত্রে চৌকি দিতে এসে সাপটাকে মেরেছে। কিন্তু ভয়েই হোক, অথবা যে কোনো কারণেই হোক, সে স্বীকার পেলে না।

হারাণের বাড়ি মড়া-কান্না উঠল। হারাণ কাঁদে, বিনোদিনী কাঁদে, সঙ্গে সঙ্গে

হাবল-মেনীও কাঁদে। বাস্তু সাপ! বড় সোজা কথা তো নয়! কি যে সর্বনাশ হবে কে জানে!

পঞ্চায়েত বসল। ভটচায মশায় এলেন। ভিন্ন গ্রাম থেকে এলেন গুরু এবং পুরোহিত। স্থির হল, ডুলিতে করে সাপ গঙ্গাতীরে দাহ করে আসতে হবে। এবং যথারীতি শ্রাদ্ধ করতে হবে।

তারাপদ ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। শুনে সে হাসলে। হোক না বাস্তু, সাপ ছাড়া তো আর কিছু নয়! তার জন্যে এত? সে ভটচাযদের সঙ্গে তর্ক করতে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে কেউ তর্কও করলে না, তার কথাও কেউ শুনলে না। একটা বাঁশের ডুলিতে করে সাপটা নিয়ে হারাণ চলল গঙ্গাতীরে। গ্রামের আরও পাঁচজন সঙ্গে চলল। রসময়ও নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে পারলে না। তাকেও আর সকলের সঙ্গে কোমরে গামছা বেঁধে যেতে হল। পাঁচ ক্রোশ দূরে গঙ্গা। রাত্রি বারোটার আগে আর ওরা ফিরতে পারবে না।

কাজে কাজেই ললিতা রইল। তারও আর যাওয়া হল না। ঘর দোর নিকুতে, হাঁড়ি ফেলতে, আর প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কান্নাকাটি করতেই বিনোদিনীর সকাল কেটে গেল। ললিতা এই সব কাজে তার সঙ্গে সঙ্গে রইল। বিনোদিনীকে নিয়ে স্নান করে এল। তার হবিষ্যান্নর যোগাড় করে দিলে। সকালটা এমনি করেই কাটল।

দুপুরে তারাপদ এল সান্ত্বনা দিতে।

তাকে দেখে ললিতা ঘোমটা দিয়ে ঘরের ভিতর চলে যাচ্ছিল। বিনোদিনী ডাকলে।

বললে, ওকে আবার লজ্জা কি! ও আমার দেওর তারাপদ। ছেলেমানুষ!

ছেলেমানুষ বই কি! বয়সে হয়তো ওদের চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়ই হবে। তবু ছেলেমানুষ ছাড়া আর কি! ওরা তো বিয়ের দিন থেকেই স্বামীর বয়স পেয়ে গেছে। ললিতা একবার আড়চোখে তারাপদকে দেখে নিয়ে বিনোদিনীর গা ঘেঁষে বসল।

বিনোদিনী ছল ছল চোখে জিজ্ঞাসা করলে, কি হবে ঠাকুরপো?

তারাপদ হেসে বললে, হবে অনেক কিছু। এখনও আরও গুটি দুই ছেলে হবে, আর গুটি তিনেক মেয়ে।

ললিতা ফিক করে হেসে ফেললে।

বিনোদিনীও কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললে। বললে, ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো, সত্যি বল।

—কিসের কি হবে ?

—এই যে বাস্তু মারা গেলেন।

—হবে আবার কি ? লোকে মেরেছে তা তোমরা করবে কি ?

ললিতাও ফিস ফিস করে বললে, তোমরা তো আর মারনি ?

—বলুন তো ?—ললিতার দিকে চেয়ে তারাপদ বললে।

বিনোদিনী নিশ্বাস ফেলে বললে, ছেলেপুলের ঘর। আমি তো ভয়ে মরি, কি যে হবে !

তারাপদর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ললিতা এবার অনেকটা সহজ কণ্ঠেই বললে, কিচ্ছু হবে না। ভাবছিস কেন ?

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, ইনি কে বড়বৌ ?

—ওটি আমার সই। আমাদের গাঁয়ের।

—তোমাদের গাঁয়ের সব মেয়েই কি সুন্দরী বড়বৌ ?

ললিতা লজ্জায় মুখ নামালে। বিনোদিনী খিল খিল করে হেসে বললে, সব মেয়ে। কেন, আমাদের গাঁয়ে বিয়ে করবার ইচ্ছে হচ্ছে ?

তারাপদ মুখ নামিয়ে বললে, তোমার ওই এক কথা বড়বৌ। সুন্দরী মেয়ে দেখলে কেবল কি বিয়ে করতেই ইচ্ছে হয় ?

—না তো আর কি ইচ্ছে হয় বল।

—জানি না।

ললিতা জিজ্ঞাসা করলে, তোর দেওরের এখনও বুঝি বিয়ে হয়নি ?

বিনোদিনী বললে, বউটি মারা গেছে।

ললিতার মুখ থেকে বা'র হল, আহা ! কত দিন হল ?

—বছর দুই হবে।

—আর বিয়ে করেননি ?

—না।

তারাপদর দিকে ললিতা একবার আড়চোখে চাইলে। তারাপদ মুখ নীচু করে বসে মেঝেয় দাগ কাটছে। ললিতার মন এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির দুঃখে ভরে উঠল। তারাপদর সম্বন্ধে কিছুই সে জানে না। কিন্তু তার বেশভূষা, তার কথাবার্তায় ললিতার ধারণা হয়েছে, সে গ্রামের সাধারণ কৃষক-সন্তান নয়। তাদের থেকে স্বতন্ত্র এবং উঁচু।

বললে, তোরা রয়েছিস, একটা ডাগর দেখে মেয়ে জুটিয়ে দিতে পারিসনি ?

—মেয়ের কি আর ভাবনা? ও বিয়ে করবে না।

—কেন?

—জুতো পরা শহুরে মেয়ে নইলে ঠাকুরপো বিয়ে করবে না।

ললিতা বিস্মিত দৃষ্টিতে তারাপদর দিকে চাইলে।

তারাপদ বললে, আপনি ওর কথা শোনেন কেন? ঠাট্টা করছে।

ললিতা বললে, তবে বিয়ে করছ না কেন?

—সময় হলেই করব।

—সময় এখনও হয়নি? আর কবে হবে?

তারাপদ এবারে শক্তর পাল্লায় পড়েছে। বললে, শীগ্‌গীরই হবে। মেয়ে আছে না কি সন্ধানে?

—আছে বই কি? কি রকম চাই বল দেখি?

তারাপদও আর ললিতাকে সমীহ করতে পারলে না। বললে, এই তোমার মতো হলেই হবে।

বিনোদিনী ফিক করে হেসে বললে, ও নিজেই আছে! দেখ যদি হয়।

—এই!—ললিতা বিনোদিনীকে এক ঠেলা দিলে।

বিনোদিনী সে তিরস্কার গ্রাহ্যও করল না। বললে, ললিতা আমাদের শহুরে মেয়ে নয় বটে, কিন্তু গানে শহুরে মেয়েদের কান কেটে দিতে পারে।

তারাপদ উৎসাহের সঙ্গে বললে, তাই না কি? আমরা একখানা শুনতে পাই না?

—কেন পাবে না? গা তো একখানা ললিতা!

ললিতা গাইবে না। ললিতা প্রকাশ্যে বহু লোকের সামনে গান গেয়ে আসে। গান গাওয়া তার ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু এই ফিটফাট বাবুবেশী তারাপদর সামনে গাইতে তার লজ্জা হচ্ছিল। অবশেষে গাইতে হল। বিনোদিনী যাকে ধরে তার নিষ্কৃতি নেই।

ললিতা গুন গুন করে গাইলে চণ্ডীদাসের একখানা পদ। তার গলার কাজে এবং স্বর-মাধুর্যে তারাপদ বিস্মিত না হয়ে পারলে না। ললিতা রীতিমত গান শিক্ষা করেছে। তার গাইবার মধ্যে ওস্তাদি আছে। দোষের মধ্যে বাক্যের বিশুদ্ধতা নেই। এ দোষ যে শিখিয়েছে তারই। সে নিজেই হয়তো পদগুলো বিশুদ্ধভাবে জানে না।

তারাপদ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, বাঃ! এ যে রীতিমত ওস্তাদ গাইয়ে। আমি এমন ভাবিনি। কোথায় শিখলে গান?

ললিতা এই প্রশংসার উত্তরে বিনম্রভাবে মাথা নীচু করলে।

বিনোদিনী বললে, ওর দাদার গান শোননি তুমি? সে যে বড় ওস্তাদ। আর ওর বোষ্টম ঠাকুরটির তো কথাই নেই!

তারাপদ বললে, ও। কিন্তু পদের কথা কতকগুলো ভুল আছে।

ললিতা নম্রভাবে বললে, তা হতে পারে।

তারাপদ ভুলগুলো সংশোধন করে দিলে। ললিতা শুনে শিখে নিলে।

ললিতা বিস্মিতভাবে বললে, তুমি এ সব গান কি করে জানলে? গাইতে জান তুমি?

তারাপদ বললে, না। আমি বইতে পড়েছি।

—এ সব বইতে আছে?

—আছে বই কি।

ললিতা বললে, আমি ভেবেছিলাম বইতে শুধু রাজার ছবি থাকে, আর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প থাকে।

তাবাপদ হাসলে। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি লেখাপড়া কিছুই জান না?

ললিতা ঘাড় নাড়লে। বললে, মেয়েমানুষকে শিখতে নেই।

—কেন?

-বিধবা হয়।

তারাপদ হেসে ফেললে। বললে, এই যে এত মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, তারা সব বিধবা হচ্ছে?

—তা জানি না। সবাই বলে তাই বলছি।

তারাপদ বললে, আর একখানা গান গাও।

ললিতার লজ্জা ভেঙে গেছে। এবারে আর সাধ্যসাধনা করতে হল না। অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট স্বরেই একখানা মাথুর ধরলে।

বেলা পড়ে এসেছিল। বিনোদিনীর গান শোনবার অবকাশ নেই। তার অনেক কাজ বাকি। হাবল-মেনী আঁচলে করে মুড়ি নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুল। সকালে কোনো কাজই হয়নি। বিনোদিনী পুকুর থেকে ঘড়া করে জল এনে শাকের খেতে দিতে লাগল। ঘরদোর ঝাঁট দিলে। গরুগুলোকে খেতে দিলে। দিনের ভাতের ফেন, তরকারির খোসা একটা বালতিতে রাখা হয়েছিল। সেগুলো গরুর পাৎনায় ঢেলে দিয়ে এল। দুটো কলাইয়ের দাল ভাঙার দরকার ছিল, তা ভাঙলে। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ল, কোদালখানা রসিকরা নিয়ে গিয়েছে সেটা আনতে হবে।

কালকেই হারাণের দরকার পড়বে। সেখানা গিয়ে নিয়ে এল। ফিরে এসে দেখে ললিতা আর তারাপদর মজলিস তখনও ভাঙেনি।

বিনোদিনী বললে, ঘাটে যেতে হবে না ?

তাইতো ! বেলা আর নেই ! ললিতা শশব্যস্তে উঠে পড়ল। বললে, তোর কাজ সব সারা হল ?

—হয়েছে।

তারাপদও উঠল। উঠতে তার ইচ্ছা করছিল না। বললে, সন্ধ্যের পর আসব বড়বৌ !

—এস।

—তোমার ভদ্রার অসুখ করেছিল, সেরেছে ?

—এক ভদ্রার সেরেছে, আবার আর এক ভদ্রা বোধ হয় বাদলালো।

তারাপদ বিস্মিতভাবে বললে, আবার কোন ভদ্রা ?

—সে সন্ধ্যের পরে এলে বলব।

ললিতা বললে, মরণ আর কি !

তারাপদ হাসতে হাসতে চলে গেল। বড়বৌ-এর মুখে কিছু বাধে না। যা মন তাই বলে। ওকে না ঘাঁটানোই ভালো।

ঘাটের পথে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরপোর সঙ্গে ভাব হল ?

—মরণ আর কি ! ওইটুকু ছেলের সঙ্গে···

—ওইটুকু আবার কোথায় ? আমাদের চেয়ে বড়ই হবে।

—তবে তুই ভাব করগে।

বিনোদিনী হেসে বললে, আমার তো রয়ে-বসে ভাব করা চলবে। তোর যে সময় নেই।

ললিতা ঘাড় নেড়ে বললে, আমার দরকারও নেই।

—তা বললে কি হয় ! সন্ধ্যেবেলায় আসবে।

বিনোদিনী একটা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হানলে।

ললিতা নাক সিটকে বললে, মরণ আর কি !

একটু পরে বিনোদিনী বললে, বেশ ছেলেটি, না ?

—বেশ ছেলে ! আমি বলছিলাম, তোর রমেশ কাকার মেয়ে হরিমতির সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না ?

—হয় তো ভালো। চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু ঠাকুরপো কেন যে বিয়ে করতে চাচ্ছে না কে জানে!

—কেন, হরিমতি তো দিব্যি মেয়ে!

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বিনোদিনী বললে, দিব্যি মেয়েই তো বটে। সেবারে একটা ছুতোয় তাকে এখানে এনে দেখিয়েও ছিলাম। কিন্তু কিছুতে রাজী নয়। আমি আর কি করব বল?

—হলে বেশ হত।

গা ধুয়ে এসে বিনোদিনী হাবল আর মেনীকে খাইয়ে দিয়ে দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরে তারাপদ এল সিগারেট টানতে টানতে। বিনোদিনী ঘুমুতে লাগল। আর তারাপদ ললিতার সঙ্গে গল্প করতে লাগল। কত দেশ-বিদেশের গল্প। সেখানকার মেয়েরা কি করে, কি ভাবে। মেয়েদের অধিকার বলতে কি বোঝে। পুরুষের কতখানি দাবি তারা মানে, আর কতখানি মানে না। নারীর রূপ-যৌবন, ওদেশের সমাজে কি তার মূল্য। স্ত্রী-স্বাধীনতা বলতে কি বোঝা যায়। এই সব কথা সে নিজে যতটা বুঝেছে, সহজ করে তাই ওদের বুঝিয়ে দিতে লাগল। ওদের নয়, শুধু ললিতাকে। বিনোদিনী মেনীকে কোলে নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘুম ভাঙল তার রাত দশটায়। চৌকাঠের নীচে দ্বারের পাশে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। হাওয়ায় সেটা নিবে গেছে। বাড়ি অন্ধকার। নিস্তব্ধ। শুধু রান্না-ঘরের পাশের তেঁতুল গাছটি অন্ধকারে শন শন করে মাথা নাড়ছে।

তারাপদ চলে গেছে? ললিতা ঘুমুল না কি?

বিনোদিনী ডাকলে, ললিতা!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

—বাবা, ঘুম বটে! ও ললিতা!

বিনোদিনী আরও বার কয়েক ডাকলে। কোনো সাড়া না পেয়ে দেশলাইটা বার করে ডিবেটা জ্বাললে। ললিতার শয্যা শূন্য। তারাপদও নেই। বিনোদিনীর মনটা ছাঁৎ করে উঠল।

সে পা টিপে টিপে গোয়ালঘর, রান্নাঘর দেখলে। সেখানে নেই। শাকের খেতে, বাড়ির পিছনের খোলা জায়গাতেও তার সন্ধান পেল না। ফিরে এসে বজ্রগর্ভ মেঘের মতো গুম হয়ে নিঃশব্দে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপরে ললিতা এল।

বিনোদিনীকে বসে থাকতে দেখে হেসে বললে, বাবা, ঘুম ভেঙেছে! ডেকে সাড়া পাই না।

বিনোদিনী সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। ললিতার হাসি তার ভালো লাগল না। এ যেন তার সেই চিরদিনের সহজ হাসি নয়। যেন শুকনো হাসি।

বিনোদিনী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলি?

—ঘাটে। পাটা কেমন জ্বালা করছিল। তোকে কত ডাকলাম। সাড়া না পেয়ে একাই গেলাম।

বিনোদিনী বললে, হুঁ।

তারপর বললে, তারাপদ চলে গেছে?

—অনেকক্ষণ!

বিনোদিনী আর কিছু বললে না। চেয়ে দেখলে ললিতার সেই সহজ ভাবটি ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার চলনে-বলনে কেমন একটা কুণ্ঠা এসেছে। বিনোদিনীর সমস্ত মন ওদের দুজনের সম্বন্ধে ঘৃণায় জ্বালা করতে লাগল।

তার নীরবতা ললিতার পক্ষে হয়তো আরও লজ্জার কারণ হত। কিন্তু যেন তার পরিত্রাণের জন্যেই বাইরে শ্মশান-প্রত্যাগতদের হরি-ধ্বনি শোনা গেল। সদর দ্বারেই আঁশবটি, নিমপাতা এবং দুখান ঘুঁটে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। শ্মশানবন্ধুরা এক টুকরো করে নিমপাতা দাঁতে কেটে বাড়ির ভিতরে এল। বিনোদিনী সকলকে গুড়-জল দিলে যে যার বাড়ি চলে গেল।

ক্লান্তিতে হারাণ ও রসময়ের দেহ যেন ভেঙে আসছিল। যা হোক কিছু মুখে দিয়েই দুজনে শুয়ে পড়ল, আর একটা কথাও কেউ কইলে না। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

ললিতা বেঁচে গেল।

চার

পরের দিন সকালে ললিতারা যখন বিদায় নেয়, বিনোদিনী কিন্তু একটিবারও বাধা দেয়নি। হারাণ বরং লাঠি ভেঁজে, সদর দরজা বন্ধ করে চীৎকার করে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রসময়ের সত্যিই থাকার উপায় ছিল না। সে হারাণের এবং বিনোদিনীর হাতেপায়ে ধরে কোনো রকমে ছাড়া পেলে। কথা দিলে বাস্তুর শ্রাদ্ধের দিন আসবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

বিনোদিনী বললে, সেই ভালো।

কিন্তু হারাণ ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললে। বললে, ভাই চিরটা কাল একলা মানুষ। একটা মায়েব পেটের ভাই নেই, একটা বোন পর্যন্ত নেই যে দুদিন এসে আমার কাছে থাকবে। তোমাদের পেয়ে বড় আনন্দে ছিলাম।

চোখ মুছে বললে, তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে অভাব আমার কিছুরই নেই। অভাব কেবল লোকের।

রসময় বললে, আবার আসব।

—এস যেন।

—নিশ্চয় আসব।

হারাণ তাদের অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। ফিরে এসে হতাশ হয়ে দাওয়ায় বসে পড়ল।

বিনোদিনী বললে, কি হল ?

হারাণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রে। কিছুই ভালো লাগছে না। দুটো মুড়ি দে, খাই। আজ আর মাঠে যাব না।

বিনোদিনী ঝঙ্কার দিয়ে বললে, তোমার সবই বাড়াবাড়ি। দুদিন রইল। কুটুম বাড়ি এসে আর কতদিন থাকবে শুনি ? বাড়িঘর নেই ?

হারাণ একটা হাই তুলে বললে, তা কি আর বুঝি না ভেবেছিস ? বুঝি। তবু কেউ চলে গেলে আমার ভারি কষ্ট হয়। কেমন যেন কান্না পায়।

হারাণের গলার স্বরটা ভারি হয়ে উঠল!

বিনোদিনী আর কিছু বলেনি।

তারপরে আরও মাস দুই কেটে গিয়েছে। ললিতা এর মধ্যে একবারও আসেনি। রসময় কিন্তু দুবার এসেছিল। শ্রাদ্ধের সময় এসে সে-দিনটা ছিল। পরের বার এসে ঘণ্টাখানেক ছিল। ললিতার খবর তারই মুখে পাওয়া গিয়েছে। মধ্যে তার শরীর ভালো ছিল না, এখন ভালোই আছে।

হারাণ বরাবর ললিতার কথা জিজ্ঞাসা করে। আনবার জন্যে বলে।

রসময় বলে, আমি তো আনতে চাই। কিন্তু তার আসা কি সহজ। কত কাজ ! ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না।

হারাণ শাসায়। বলে, আচ্ছা না আসুক। আমি নিজেই একবার হুট করে গিয়ে হাজির হব। চাষের কাজ একবার মিটুক না !

কিন্তু তার আর চাষের কাজও মেটে না, হুট করে যাওয়াও হয় না।

বিনোদিনী যে ললিতার সম্বন্ধে একেবারেই নিরুত্তর থাকে, তাও নয়। ভদ্রতা রক্ষার জন্যে যা করা আবশ্যক সবই করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মন তার ললিতার সম্বন্ধে খুশী নয়। ললিতাকে এখানে আনা সম্বন্ধে আগের মতো তেমন আগ্রহ তার আর নেই।

এমনি করে আরও কিছুদিন গেল। পুজো আর এল বলে।

সকাল হতেই সোনালী আলোয় উঠোন ভরে যায়। ধানের খেত, পুকুরের উঁচু পাড়, গাছের মাথা সেই আলোতে ঝলমল করে ওঠে। চারিদিক যেন গলিত সোনায় ডুবে গেছে।

শিউলির গাছে গাছে ফুটেছে হীরার কুচির মতো অজস্র ফুল। ভোর হতে না হতে তার তলে তলে বহু ছেলেমেয়েদের ভিড় হয়। ফুল কুড়োনোর মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি। প্রত্যেকে সেই ফুল কুড়িয়ে, হলদে বোঁটাগুলো ছাড়িয়ে ডালায় করে উঠোনে মেলে দিচ্ছে। এই বোঁটাগুলো শুকোবে, সেগুলো সিদ্ধ করে তাই দিয়ে বাসন্তী রঙে কাপড় ছোপাবে, সেই কাপড় পরে পুজোর উঠোনে ঘুরে বেড়াবে, এখন থেকে তারই আয়োজন। কিন্তু সে আনন্দ ক'জন ভোগ করবে কে জানে ! ভোরের শিশিরে ভিজে অনেকেই জ্বরে পড়বে—ম্যালেরিয়া জ্বরে।

আউশ ধানে কেবল থোড় বাঁধছে। কচি কচি থোড়। প্রথম অন্তঃসত্ত্বা নারীর মতো তার পাতায় পাতায় একটা অপরূপ লাবণ্য যেন উছলে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেরা সেই থোড় টেনে তুলে তীরের মতো আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কি যে আনন্দ পাচ্ছে তারাই জানে। এই অপচয়ের জন্যে মাঝে মাঝে ধমকও খাচ্ছে বড়দের কাছ থেকে। তবু কি গ্রাহ্য করছে ? সুবিধা পেলেই আবার ছুঁড়ছে।

বিলে ঘোলাটে বান এসেছে। আর তারই ধারে ধারে ফুটেছে অজস্র কাশের ফুল। কমলপুরের মেয়েরা একদিন দল বেঁধে সেই ময়লা-সমাচ্ছন্ন ঘোলাটে জলে স্নান করে এল। গ্রামের পুরুষেরা সেদিন আর বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পেলে না। মাত্র দু-একজন মেয়েদের পাহারায় সঙ্গে গেল। সে মিছিল দেখতে কি শোভা? আলের পথে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে রঙ-বেরঙের শাড়ীপরা প্রায় শতখানেক মেয়ে। সঙ্গে কাচ্চা-বাচ্চা আছে। কেউ কোলে, কেউ বা যাচ্ছে হেঁটে। শিশুসুলভ কৌতূহলের বশে, কখনও বা কাশ-কুসুমের লোভে মাঝে মাঝে তারা পিছিয়ে পড়ছে, দলভ্রষ্ট হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে অমনি কোলাহল পড়ে যাচ্ছে। ছেলেদের উপর অজস্র কটূক্তি বর্ষিত হচ্ছে। ছেলেরা আবার দলের মধ্যে ফিরে আসছে। এমনি করে আধ ঘণ্টার পথ তিন ঘণ্টা যেতে লাগল। তারপরে আবার স্নান-পর্ব আছে। নিজেদের এবং ছেলেদের। এ সব সেরে যখন তারা ফিরল তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এ সব দিনে পুরুষদের বলবার কিছু উপায় নেই। মেয়েরা কি সমস্ত জীবনভোরই শুধু রান্নাবাড়া আর ঘরকন্নার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকবে! তাদের কি একটা দিনও পুণ্য সঞ্চয় করতে ইচ্ছে হয় না? বারো মাস মেয়েরা সংসার চালায়, পুরুষরা কি একটা দিনও পারবে না? ভারি তো একটা বেলার রান্না!

হারাণ রান্নার কাজ মোটে পারে না। তবু আজকের দিনে সকাল সকাল স্নান সেরে রেঁধেবেড়ে বসে আছে। বিনোদিনী কখন যে ফিরবে কে জানে! তারপরে রান্না চড়ালে আর খাওয়ার সময় থাকে না। তবে বেশী কিছু রাঁধেনি। ভাতের সঙ্গে আলু, পটল, ঝিঙে সিদ্ধ। আর মাছের টক। কিন্তু বিনোদিনী এসে তাই যখন তাকে বেড়ে দিলে হারাণ না পারে অভিযোগ করতে, না পারে গিলতে। তরকারিগুলো ধোয়া হয়নি। ফলে ভাতেসুদ্ধ এমন একটা বিশ্রী গন্ধ হয়েছে যে, যার নাক আছে তার পক্ষে সে ভাত মুখে তোলা অসম্ভব। অথচ ভাত দিব্যি ঝর-ঝরে হয়েছে। গলেওনি পোড়েওনি। রান্না বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জানে বলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই রেঁধেছে। হারাণ বুঝতে পারে না ত্রুটি কোথায়।

কিন্তু বিনোদিনী সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললে। এমন একটা নিতান্ত সহজ বিষয়ে পুরুষের অপটুত্ব দেখে তার আর হাসি থামে না।

বললে, তরকারিগুলো হাঁড়িতে দেবার সময় ধুয়ে নাওনি তো?

—তাই হবে। হারাণ যেন হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছে এইভাবে সোৎসাহে বললে, দেখেছ!

—তুমিই দেখ। আমি সে সব জানি না। কিন্তু একটি ভাত ফেলতে পাবে না।

উত্তরে হারাণ বোকার মতো হাসলে।

সে হাসি দেখে বিনোদিনীর মমতা হল। হেসে বললে, থাক, আর খেতে হবে না, ওঠ। আমি এখনি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি।

হারাণের গালে তখনও এক গ্রাস ভাত। কোঁৎ করে সেটা চোখ বন্ধ করে গিলে ফেলে বললে, পারব না কেন? খুব পারব। অখাদ্যি তো আর নয়!

বলে আবার একটা বড় মতন গ্রাস পাকাতে লাগল।

বিনোদিনী ধমক দিলে, আবার খাচ্ছে। নিষেধ করলাম না?

হারাণ যেন বেঁচে গেল। হাতের গ্রাসটা পাতে ফেলে উঠে পড়ে বললে, তবে যা মন তাই কর।

অতগুলো ভাত নষ্ট হল দেখে বিনোদিনীর ক্ষোভও হচ্ছিল। নিজে অবশ্য ওই ভাতই সে খাবে। কিন্তু হারাণের জন্যে তো রাঁধতে হবে। তার পরিমাণও এই দুর্বৎসরে উপেক্ষণীয় নয়।

গজ্ গজ্ করে বলতে লাগল, আমারই ঘাট হয়েছে। মরতে রেঁধে রাখতে বলেছিলাম। তবু ভাগ্যি যে গেলবারের মতো এবার আর হাত পোড়াওনি। যা পার না, তুমিই বা তা করতে গেলে কেন? মিছিমিছি এতগুলো চাল নষ্ট!

হারাণ গম্ভীর হয়ে বললে, তুই বললি কেন?

বিনোদিনী তার কথা যেন একটা ঝাপ্টায় উড়িয়ে দিয়ে বললে, আমি বললাম বলেই করবে? আমি যদি লোকের ঘরে আগুন দিতে বলি, দেবে?

হারাণ আর কথাটি কইলে না। আঁচাবার জন্যে খিড়কির ঘাটে দৌড়ল।

বিনোদিনী আবার রান্না চড়ালে।

হারাণ এক কলকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে পাড়াটা একবার ঘুরে এসেই দেখলে রান্না শেষ। শুধু সিদ্ধ আর ভাত নয়,—একটা তরকারিও এরই মধ্যে হয়েছে।

বিনোদিনীকে আর সে কষ্ট দিলে না। নিজেই পিঁড়ি পেতে জায়গা করে নিলে। এক গ্লাস জলও গড়ালে। ভব্যিযুক্ত হয়ে খেতে বসে এক গাল হেসে বললে, এর মধ্যে এত কি করে রাঁধলি? আমি তো ওই রাঁধতেই দুপুর গড়িয়ে ফেলেছিলাম!

বিনোদিনী হেসে বললে, তুমি খুব বাহাদুর!

হারাণের খাওয়া হয়ে গেলে বিনোদিনী নতুন রান্না ভাত জল দিয়ে আলাদা করে রেখে দিলে। রাত্রে হারাণ আর ছেলেরা খাবে। নিজের জন্যে সেই দুর্গন্ধ ভাত বেড়ে নিলে। যদি কেউ সেখানে উপস্থিত থাকত, বিনোদিনীর মুখ দেখে এবং খাওয়া দেখে কিছুতে বুঝতে পারত না সে দুর্গন্ধ ভাত খাচ্ছে। খাওয়া নিয়ে মেয়েদের খুঁত খুঁত করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী ছাড়ে।

খাওয়ার পরে হারাণ দাওয়ায় শুয়ে আপন মনে গজ্ গজ্ করতে লাগল। এবারে সব জমিতেই লোনা লেগেছিল। তার জন্যে নুনের খরচ বেশী হয়েছে। কিছু দাম বাকি ছিল। আজ সকালে হর মুদী সেইটে চাইতে এসেছিল। বিরক্তি সেইজন্যে।

বিনোদিনী বললে, নুন দিলে ফসল যে দুনো হবে তার কি বলছ? বড় পুকুরের নীচে জোলের বেঁকিখানা তো যেতে আসতে প্রায়ই দেখতে পাই। ধান একেবারে কালো মিশমিশ করছে!

জমির প্রশংসা শুনলে হারাণ অত্যন্ত খুশী হয়। জমিগুলি যেন তার ছেলেমেয়ে। নিজের হাতে তাতে সে সার দিয়েছে, নিজের হাতে চাষ করেছে, নিজের হাতে তাতে বুনেছে ধান। আর কি যত্ন! প্রত্যেক দিন একবার করে তার জমি দেখতে যাওয়াই চাই। হয়তো কোথাও দু-একটি আগাছা কেবল দেখা দিয়েছে, সেগুলি তুলে দেবে। হয়তো কোথাও আল একটুখানি ধ্বসে গিয়েছে, কিংবা ফুটো দিয়ে জল বার হচ্ছে, দু-চাপড়া মাটি দিয়ে তা ঠিক করে দিতে হবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়, গরু বাছুরে ধান না খেয়ে যায়, জমির আল কেটে জল না কেউ বার করে নিয়ে যায়, ঝোড়া কাটবার ছলে কেউ না ধানের গুছি কেটে নিয়ে যায়। এর উপর আড়ায় মাছ পড়ছে প্রচুর। রাত্রে একবার করে সেখানে যেতেই হয়। নইলে হয়তো কেউ মাছ ঝেড়ে নিয়ে যাবে। এ সব কাজে তার আলস্য নেই। বরং যথেষ্ট উৎসাহ। লকলকে ধানের জমির দিকে যখন সে চায়, তার চোখ দিয়ে যেন গভীর স্নেহ ঝরে ঝরে পড়তে থাকে।

বিনোদিনীর কথায় সে উৎসাহে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। হাত নেড়ে বললে, এবারে ধানে যা গুছি বেঁধেছে, জলে দাঁড়িয়ে ফুলোতে যদি পায়, দুনো ফসল তোকে নিজের হাতে মেপে দোব।

বিনোদিনী হেসে বললে, তবে পাঁচ টাকার নুনের জন্যে অত দুঃখ কিসের?

হারাণ আবার শুয়ে পড়ল। বললে, সে তো হবে রে জানি, কিন্তু এখন টাকা পাই কোথায়? হরর বাকি্য তো শুনেছিস!

উত্তেজনায় তার লাল লাল চোখ ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগল।

বিনোদিনী মৃদু কণ্ঠে বললে, হাবলের কোমরের সোনার মটরটা বন্ধক দিলে হয় না? ওটা তো আর কেউ পরে না।

হারাণ মাটিতে একটা চাপড় দিয়ে বললে, দীনু দত্তর কাছে তো? টাকায় ছ-পয়সা সুদ, তা খেয়াল আছে?

বিনোদিনী উত্তরে আরও একটা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হারাণ কর্কশ কণ্ঠে বললে, না, না। ওসব ধারধোরের কথা বলিস না। লবদ্বীপের অমন হল কেন? ওই ধারে। একশো টাকা ওর বাবা দীনু দত্তর কাছে ধার করেছিল। তার মোট সুদ দিয়েছিল সাতশো টাকা। তাতেও শোধ যায়নি। আরও পাঁচশো টাকার দায়ে তার সব্বস্ব গেল। সেই ধার তুই আমাকে করতে বলিস? হুঁ! বলে, মেয়েমানুষের সব্বনেশে বুদ্ধি! বটে তাই!

বলে হারাণ আবার শুয়ে পড়ল।

বিনোদিনী বললে, তবে নুনের দামটা দেবে কি করে?

—সে যা হয় এক রকম করে দেওয়া যাবে।

বিনোদিনী বুঝলে হারাণ রেগে গিয়েছে। সেজন্যে ঋণ শোধের পন্থা সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না।

এমন সময় বাইরে চটিজুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারাপদর আবির্ভাব! সাজগোজের বাহুল্য নেই। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, কোঁচা নেই। তাকে দেখেই বিনোদিনী মুখ নামালে। সেই সন্ধ্যার পরে বিনোদিনীর সঙ্গে তার আর দেখা নেই। এই প্রথম।

হারাণ জিজ্ঞাসা করলে, কি রে কখন এলি?

—আজ সকালে। ভালো আছ?

—আছি এক রকম। বস, বস।

—বসি।

বলে তারাপদ দাওয়ায় উঠে বসল। একবার আড়চোখে বিনোদিনীর দিকে চাইলে। কিন্তু দৃষ্টি-বিনিময় হল না। বিনোদিনী তখন নতনেত্রে একাগ্রমনে পায়ের নখে করে মাটি খুঁড়ছিল। আর ভাবছিল, কোনো কথা না বলে উঠে চলে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু ঠেকবে কি না।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, আশা করা যায় ধান এবার ভালোই হবে। কি বল হারাণদা?

—ধান ? তা জলে যদি কুলোয় তা হলে···

বিনোদিনী হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই শোলপৌনির ছড়া কি হল ?

—শোলপৌনি ! ও হাঁ। শোলপৌনি···

হারাণ হা হা করে হেসে উঠল।

তারাপদ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, শোলপৌনি কি ?

হারাণ হাসি থামিয়ে বললে, সেই আষাঢ়ে নবমীর ছড়াটা। কি জানিস, কলি-কালে ওসব আর মেলে না।

তারাপদ কিছুই বুঝলে না। কিন্তু সে আর দ্বিতীয় প্রশ্নও করলে না। সে এসেছিল বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করতে। নিরিবিলি। পরের দিন সকালেই সে ললিতার কাছে তাদের দুজনের সম্বন্ধে ওর মনোভাবের সংবাদ পেয়েছিল। তখন আর সঙ্কোচে, লজ্জায় এবং কিছু পরিমাণে ভয়েও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এ গ্রামে তার সব দিক দিয়ে সুনাম আছে। বিনোদিনী যদি তাদের কাণ্ড ইঙ্গিতেও প্রকাশ করে দেয়, তা হলে আর গ্রামে মুখ দেখানো কঠিন হবে। হঠাৎ পালিয়ে যাবার সেও একটা কারণ। কিন্তু দীর্ঘকালের মধ্যে আকারে, ইঙ্গিতে, কিংবা কোনো চিঠিপত্রে এ সম্বন্ধে কোনো সংবাদই যখন পেলে না, তখন অনেকটা ভরসা হল। ভরসা হল বিনোদিনী নিশ্চয়ই প্রকাশ করেনি। ওর উপরে তার শ্রদ্ধা হল। তার বরাবরই মনে হয়েছে বিনোদিনী পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মেয়ে থেকে স্বতন্ত্র। সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত হল।

কিন্তু কিছু একটা বলা তো চাই। তারাপদ বললে, চাষের খরচও এবার কম হয়েছে। তাড়াতাড়ি তো ছিল না। বাইরের মজুর বড় একটা দরকারই হয়নি। কি বল ?

হারাণ একটু দ্বিধাভরে বললে, তা বটে। তবে ওই নুন। নুন এবার সব জমিতে লেগেছে। বিঘে পিছু পাঁচ সের করে নুন। তবে দেখ না হিসেব করে।

—তা ঠিক।

—আর কাঁকড়ার উৎপাত ছিল। প্রায় জমিই দুবার করে রোয়াতে হয়েছে। আর বীজ অমিল হয়ে গেল। জোড়াপুকুরের নীচের বড় বাকুড়িখানার জন্যে বীজ আনতে হল ধুলোডাঙা থেকে। এমনি কাণ্ড ! আবার ধুলোডাঙায় এমনি মজা যে পুব মাঠ ছাড়া আর কোনো মাঠে এক ফোঁটা বর্ষণ হল না। সব পতিত আছে। তা নইলে কি আর বীজ পাওয়া যেত। হাঃ হাঃ হাঃ !

খুশিতে হারাণ কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল।

বললে, জল এই আমাদের এইটুকুনটাতেই যা হয়েছে। আর কোথাও নেই। তারও কারণ আছে।

বলে হারাণ গম্ভীরভাবে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তারাপদ জিজ্ঞাসা করলে, কি কারণ?

—আছে।

—শুনিই না।

হারাণ একটা অত্যন্ত গোপন খবর দেবার মতো গলা নামিয়ে বললে, পুষ্কর বাঁধা।

—কি রকম?

হারাণ নবদ্বীপের কাছে যা শুনেছিল হুবহু বলে গেল। শুনে বিনোদিনী পুষ্করের প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। তারাপদ গম্ভীরভাবে জুতোর উপরে টোকা দিতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলে না। প্রথমে ফিক করে, তারপর সজোরে হেসে ফেললে।

হারাণ বিস্মিতভাবে বললে, হাসলি যে!

—তোমার যত আজগুবি গল্প!

—আজগুবি মানে? সবাই জানে এ কথা। নইলে পুষ্করে দুষ্কর বারি। এবারে কোথাও বৃষ্টি হল না, কেবল এই খানিকটা জায়গা নিয়ে হল, দেখতে পেলি না?

—কত জায়গায় হয়েছে।

—হয়েছে! তুই সব খবরই রাখিস কি না!

হারাণ তারাপদর নাস্তিকতায় রেগে বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। তারাপদও তাই চাইছিল। এতক্ষণে বিনোদিনীকে একলা পেলে। বিনোদিনীর দিকে চেয়েই সে হেসে ফেললে। বিনোদিনী যদিচ হাসলে না, কিন্তু মনের মধ্যে ওর সম্বন্ধে সেই ক্রোধও যেন এরই মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে।

তারাপদ যুক্তকরে বললে, অমন গম্ভীর হয়ে থেক না বড়বৌ। আমাকে যা হোক কিছু একটা বল।

মুখ নামিয়েই বিনোদিনী উত্তর করলে, কি বলব?

—যা খুশি। পাজি, ছুঁচো, গাধা, স্টুপিড ···

তার বলবার ধরনে বিনোদিনী হেসে ফেললে। বললে, কিচ্ছু বলবার নেই।

—তবে হেসে দুটো ভালো কথা বল, যা চিরকাল বলে এসেছ। অমন করে থেক না।

—তাও বলতে পারব না।

তারাপদ চুপ করে রইল। বিনোদিনীর হাসি দেখে তার অনেকটা সাহস হয়েছিল। এবারের কণ্ঠস্বর শুনে সে সাহস যেন এক ফুঁয়ে নিবে গেল।

বিনোদিনী আরও রূঢ়কণ্ঠে বললে, তুমি আর এ বাড়িতে এস না। আমি তোমাকে যা ভাবতাম তুমি তা নও।

—নই ?

—না। আমি অবিশ্যি কাউকে কিছু বলিনি। কিন্তু আমাকে বেশী জ্বালাতন করলে সব ফাঁস করে দোব।

তারাপদ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। বিনোদিনী আর তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

তারাপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এইজন্যেই কলেজ কামাই করে বাড়ি এলাম !

এ কথা যেন বিনোদিনীর কানেই গেল না। সে যেমন ঝাঁট দিচ্ছিল তেমনি দিতে লাগল।

হঠাৎ তারাপদ ঘরের মধ্যে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কী অন্যায় করেছি আমি ? এমন কি আর কেউ কোনোকালে করেনি ? এই প্রথম ?

ওর স্পর্ধা দেখে বিনোদিনী অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে।

তারাপদ বলতে লাগল, কেউ করেনি ? তুমিও করনি ?

বিনোদিনী চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত থেকে ঝাঁটা খসে গেল। স্খলিত-কণ্ঠে বললে, আমি কি করেছি ? আমার সম্বন্ধে তুমি কি জান ?

উন্মাদের মতো মাথা নেড়ে তারাপদ বললে, সব জানি। ললিতা যা জানে, আমি সে সবই জানি। তা যদি প্রকাশ করে দিই, কি হবে তোমার ?

বিনোদিনীর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছিল। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছিল। কিন্তু জিহ্বা যেন কঠিন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কোনোরকমে বললে, সব জান ?

ওর জ্বলন্ত চোখের ক্রুদ্ধ শূন্য দৃষ্টি, তারাপদর মনে হল, যেন দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেল। মনে হল ও যেন একা। এ সংসারের সমস্ত কিছু যেন ওর সান্নিধ্য থেকে ঝরে ঝরে পড়ে গেল। তারাপদর ভয় হল।

অপরাধীর মতো বললে, আমি কিচ্ছু জানি না বড় বউ। আমার ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা কর।

কিন্তু বিনোদিনীর তখন সংজ্ঞা নেই। পাথরের মূর্তির মতো সে যেন কিছু শুনছেও না, বুঝছেও না।

তারাপদ আর থাকতে পারলে না। সে হুমড়ি খেয়ে বিনোদিনীর পায়ের উপর পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

—বড়বৌ আছিস না কি?

রসিক পালের স্ত্রী। দরজার কাছ থেকে ওদের দুজনকে ওই অবস্থায় দেখে এক হাত জিভ কেটে সরে দাঁড়াল।

বিনোদিনীর চট করে সংবিৎ ফিরে এল। একটা ঝটকায় পা মুক্ত করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল।

—কি বলছিলে দিদি?

দিদি তখন ছুটছে। পিছন পানে চাইবার তার অবসর নেই। ছুটছে স্নানের ঘাটে যেখানে বহু মেয়ের ভিড় হয়েছে। এতবড় একটা ঘটনা তাদের কাছে না বলা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

—ও দিদি, চললে কেন? ও যে তারাপদ!

কিন্তু দিদি আর ফিরল না। মুহূর্তের মধ্যে পাচিলের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই ধূসর অপরাহ্ণে ছায়ামূর্তির মতো বিনোদিনী আড়ষ্টভাবে খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথার কাপড় খুলে গেছে। আঁচল দাওয়া থেকে উঠোনে গিয়ে লুটোচ্ছে।

একটু পরে সোজা সবল পদক্ষেপে বিনোদিনী ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। তারাপদ ভয় পেয়ে একটা কোণে গিয়ে লুকিয়েছে। অন্য সময় তাকে এই অবস্থায় দেখলে বিনোদিনী হেসে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু তখন তার মনের অবস্থা অন্যরূপ।

কঠিন কণ্ঠে বললে, বেরিয়ে এস।

তারাপদ সাহস পাচ্ছে না। চাপা গলায় বললে, চলে গেছে?

—গেছে। তুমি বেরিয়ে এস না?

চোরের মতো সন্তর্পণে তারাপদ বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। মুখ তার শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে।

বিনোদিনী ধমক দিলে, দেরি কচ্ছ কেন? যাও না! আমার যা সর্বনাশ করবার তা তো করা হল!

তারাপদ এ সব কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটা ছুট দিলে।

বিনোদিনী সিঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে নিস্তেজের মতো দাওয়ায় এসে বসল।

বিকেলের কাজ কিছুই করা হয়নি। উঠোন অপরিষ্কার হয়ে আছে। মেনী দাওয়ার এক কোণে পুতুল খেলা করেছিল। কাপড়ের পাড়, আতার পাতা আর ছোট ছোট ধুলোর ঢিপিতে সে কোণটা নোঙরা হয়ে আছে। আর হাবল যেখানে মাটির গরু নিয়ে খেলা করছিল, সেখানকার তো কথাই নেই। যেন আঁস্তাকুড় হয়ে আছে।

তারাপদর কোণে গিয়ে লুকোনো আর তার পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা নতুন করে বিনোদিনীর চোখে ভেসে উঠল। বিনোদিনী হেসে ফেললে।

কি হয়েছে কি? রসিকের স্ত্রীর সন্দিগ্ধ মন। সে সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু তারাপদ ভয় পেয়ে লুকোল কেন? কি অপরাধটা করেছে সে? কিন্তু তখনই বিনোদিনীর মনে হল, ভয় সেও কম পায়নি। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। কি সে তা জানে না। কিছু হয়েছে। নইলে তার মনেই বা ভয় এল কেন? তার কেন মুখ শুকিয়ে গেল? দেহ কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেল? মনের সে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যই বা কই? কোথায় সেই নির্মেঘ হাসি?

রসিকের স্ত্রী ঘাটে এতক্ষণ কি করেছে কে জানে! তার কি সন্ধ্যার আগে ঘাটে যাওয়া উচিত হবে? কিন্তু আজ না গেলেও কাল তো যেতে হবে। আজ না হয় খিড়কির পুকুরেই গা ধুয়ে চালিয়ে দেবে। কাল? নাঃ! লজ্জাকে প্রশ্রয় দিয়ে লজ্জার কারণ না বাড়ানোই ভালো। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বিকেলের কাজ সেরে ঘড়া নিয়ে ঘাটে চলল।

পাঁচ

ঘাট তখন জমজমাট

শেষ অপরাহ্ণের সোনালী আলোয় চারিদিক টুলটুল করছে। আউশের খেতে তাজা ধানগুলি লিক লিক করছে। এখানে-ওখানে দু-চারটে চাষী গামছা পরে, মাথায় মাথালি দিয়ে জমির আল বেঁধে জল আটকাচ্ছে। কেউ বা ঝোড়া কেটে মাথায় করে বাড়ি ফিরছে। কেউ ফিরতিমুখে রাত্রের তরকারির জন্যে গোটাকয়েক কাঁকড়া সংগ্রহ করে নিচ্ছে। আর মনের আনন্দে গান ধরেছে :

কহিও প্রাণনাথে শ্রীরাধা আর বাঁচবে না।
শ্রীরাধা আর বাঁচবে না গো, শ্রীমতী আর ···

গান শেষ হতে পাচ্ছে না। মধ্যপথেই থেমে যাচ্ছে। একটা বড় কাঁকড়া হাতের পাশ দিয়ে ছুটে গর্তে ঢোকবার চেষ্টা করছে। গান শেষ করতে গেলে আর সেটা ধরা হয় না। সেটা ধরে তার ডানা ভেঙে আঁচলে পুরে গান শেষ করছে :

···শ্রীমতী আর বাঁচবে না।

এমনি বহু গানের টুকরো, কোথাও একটা কলির প্রথমার্ধ, কোথাও বা শেষার্ধ, অপরাহ্ণের রবিকরস্রোতে ভেসে ভেসে আসছে টুকরো টুকরো মানিকের মতো। যেন অনন্ত সঙ্গীত-সমুদ্রের একটি বুদ্‌বুদ সূর্যকিরণে ক্ষণকালের জন্যে ঝিকমিক করে উঠছে।

ভাদ্রের ভরানদী। ঘাটের কোল পর্যন্ত জল উঠেছে। বেশী জলে নামার উপায় নেই। সেখানেই গলা ডুবিয়ে মেয়েরা গা ধুয়ে নিচ্ছে। নদীর ছলাৎ ছলে, মেয়েদের কলরবে ঘাট মুখর। তাদের ছোট্ট পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—কোনো প্রসঙ্গ আর এই কলরবের মধ্যে বাদ যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে কারও মেয়ে হয়তো ঘাট ছেড়ে অনতিদূরের কলকে গাছের ডাল নুইয়ে ধরে ফুলের মধু খাচ্ছে, তাকে শাসন করাও আছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকেই কলিকালের মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে আক্ষেপও জানাচ্ছে। এবং এর পরে আরও কি হবে ভেবে নারীজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হচ্ছে।

কিন্তু সকলের চেয়ে জমেছে বিনোদিনীর প্রসঙ্গ। রসিক পালের স্ত্রী মধুচক্রে

সেই যে ঢিল ছুঁড়ে চলে গিয়েছে, তারই গুঞ্জন এখনও থামেনি। দলে দলে মেয়েরা আসছে যাচ্ছে, নতুন নতুন শ্রোতার অভাব নেই। গুঞ্জন যদি-বা একটু ঝিমিয়ে আসছে, নবাগত দলের কল্যাণে আবার দ্বিগুণ বেড়ে উঠছে।

যে শুনছে সে-ই অবাক হচ্ছে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে এমন কথা শোনবার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। বিনোদিনী স্বামীর সঙ্গে সমস্ত রাত কলহ করে বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ সে কলহপরায়ণা নয়। অন্য কারও সঙ্গে বড় একটা কলহ করেও না। এবং সে হারাণের সঙ্গে কলহ করলেও তার সেবা-শুশ্রূষার বিষয়ে কখনও ত্রুটি করেছে বলে কেউ শোনেনি। তারাপদও বহুকাল থেকে হারাণের বাড়ি যায়। বিনোদিনীকে সে বৌদি বলে। বিনোদিনীও বহুকাল থেকে তার সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশে আসছে। দেবর সম্পর্কে তার সঙ্গে চিরাচরিত প্রথায় রসিকতা করে আসছে। এর মধ্যে কোথাও সঙ্কোচ ছিল না, দোষের কিছু ছিল না। আর পাঁচজন বধূ তারাপদর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, সেও তাই করে। তারাপদর সঙ্গে অবশ্য তাদের নিকট আত্মীয়তা কিছু নেই, কিন্তু গ্রামের মধ্যে গ্রামসম্পর্কও উপেক্ষণীয় নয়। নিকটতম রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় যে সামাজিক ব্যবহারনীতি অনুসরণ করে, গ্রামসম্পর্কীয় আত্মীয়ও তার চেয়ে এক তিল কম করে না। মাঝে মাঝে বিপ্লব যে না ঘটে তা নয়, কিন্তু খুব কম। সেইজন্যেই ইতিমধ্যে এদের দুজনের সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে যে ক্লেদ জমে উঠেছে (রসিক পালের স্ত্রীর চাক্ষুষ প্রমাণের পর এ বিষয়ে আর কারও মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই), সে সন্দেহ কেউ করেনি। এখন সব জলের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এখন সকলেই একবাক্যে বলতে লাগল, দেওর-ভাজে হাসি-তামাসা হবে না কেন, হয়। তাই বলে অত? দেশে আর দেওর-ভাজ নেই? আমরা কিছু বুঝি না?

—সোয়ামীর সঙ্গে কার না ঝগড়া হয়? অমন তো কোথাও দেখিনি।

—বিষ লাগছে যে! আর কি সোয়ামীর ওপর মন আছে? এখন দুচক্ষের বিষ হয়েছে।

—আর কি ভালো লাগছে? ও বুড়ো এখন গেলেই ওর হাড়ে বাতাস লাগে!

—কোন্ দিন বিষ দিয়ে না মেরে ফেলে তো বাঁচি। ও সব নচ্ছার মেয়েতে সব পারে।

—পারে বই কি! ওদের অগম্যি ঠাঁই নেই, অকম্মি কাজ নেই। আমার বাপের বাড়ির দেশে···

এ সব আলাপ আলোচনার মানে কিন্তু এ নয় যে, আলোচ্য লোমহর্ষণ কাণ্ডে সকলে ঘৃণায় লজ্জায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। ওরা এই আলোচনায় চমৎকার রস পাচ্ছে। অম্লমধুর বস্তুর মতো এই প্রসঙ্গ টাকান্ দিয়ে দিয়ে আস্বাদ করছে। এক একটা মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহ হিল্লোলিত হয়ে উঠছে, তালে তালে বাহুযুগল ললিতভঙ্গিতে নৃত্য করে উঠছে, চঞ্চল চোখ থেকে হাসি যেন ছিটকে ছিটকে পড়ছে। আর রসনায় তো স্বয়ং বীণাবাদিনীই আশ্রয় নিয়েছেন। সকলেই বিনোদিনীর উপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছে। রতনমণিও এ মজলিসে কম রস জমাচ্ছিল না। কিন্তু অবশেষে একটা কথা না বলে সে থাকতে পারল না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে নয়, এ একেবারে তার অন্তরের কথা।

বললে, তা বাপু, ওরও নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না। ওর ওই বয়েস, আর ওই রূপ! বাপ-মা বুড়োর গলায় বেঁধে দিয়েছে বলে চিরকাল যদি বাঁধা ও না থাকে!

রতনমণি তার অন্তরের সত্য কথাতেও পরিহাসের ফোড়ন দিলে। কথাটার মধ্যে যেন কিছু রসিকতা আছে এইভাবে সকলের দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসলে। এর বেশী আর বলতে সে সাহস করলে না। কারণ তার নিজের চরিত্র অনিন্দনীয় নয়।

রতনমণির বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বিধবা। কিন্তু যখন সে বিধবা ছিল না তখনও স্বামীর ঘর বড় একটা করেনি। বৃন্দাবনকে কৈশোর থেকেই সে যে কি চোখে দেখেছে, লজ্জা-সরম কুল-মান কিছু আর রাখতে পারলে না। সমাজের মধ্যে বসে এ বড় কম সাহসের কথা নয়। ওরা বৈষ্ণব নয় যে কণ্ঠিবদল করে দোষ কাটাবে। গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গেল। দেখতে দেখতে এ খ্যাতি গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরেও বিবৃত হল। তার ফল হল এই যে, রতনমণির যেটুকু লজ্জা ছিল তাও আর রাখবার প্রয়োজন হল না। তার তখন ভরন্ত যৌবন। বৃন্দাবনেরও উঠতি বয়স, শরীরে অপরিসীম শক্তি। কোনো কিছু গ্রাহ্য করার অবকাশ নেই। তারা দুজন ছাড়া আরও অনেকে যে সমাজ বেঁধে এখানে বাস করে, সে সমাজের যে প্রচলিত বিধিনিষেধ, আইন-কানুন, সুনীতি-দুর্নীতি, ভালো-মন্দ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে সে আর ওদের চোখেই পড়ল না। কিন্তু এমন করেও বেশী দিন চলল না। রতনমণির যৌবনে ভাঁটা পড়তে লাগল। বৃন্দাবনেরও রক্তের তেজ কমে আসতে লাগল। তার সঙ্গে ঋণের পরিমাণও বেড়ে উঠল। জমি-জায়গা যা ছিল তার অনেক গেল নিলাম হয়ে। বাধ্য হয়ে তাকে ঘর-গৃহস্থালী এবং স্ত্রী-পুত্রের দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হল। রতনমণিরও আবার নতুন লোক জুটল। দুদিন পরে সে চলে গেল, আবার এল অন্য লোক।

তারপর আবার অন্য লোক। তার ছেলেটি এখন বড় হয়েছে। কিন্তু তারও সয়ে গেছে। বাধা দেবার প্রবৃত্তিও হয় না, শক্তিও নেই। একটা সামাজিক গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু মধ্যে বৃন্দাবন থাকায় এবং এই ব্যাপারে রাগের মুখে আরও অনেকের বাড়ির বিস্মৃতপ্রায় কলঙ্ক-কথা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় আয়োজনটা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। রতনমণি সকলের মধ্যে চমৎকার মিশে গেছে। এখন আর তাকে দেখে তার চরিতকথা কারও মনেও পড়ে না। কেবল সে নিজে ভুলতে পারে না। সঙ্কোচ হয়।

রতনমণির কথা যেন সমবেত নারীমণ্ডলীর মধ্যে তপ্ত তেলে জলের ছিটার মতো চিড়বিড়িয়ে উঠল ঃ

—মরণ আর কি!

—বুড়ো বর বুঝি বর নয়। শালগেরামের সামনে···

—রূপ যৌবন বুঝি ছেরকাল থাকবে? তখন?

—ছুদিন পরে কুষ্ঠব্যাধি হবে যে! সর্বাঙ্গ খসে যাবে না?

—মুখে পোকা পড়ুক। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করা শেষ হোক। অমন মহাদেবের মতো সোয়ামী পছন্দ হয় না?

এমন সময় দূরে বিনোদিনীকে দেখা গেল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তার মুখে অস্তরবির আভা এসে পড়েছে। তার সুন্দর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ায় কেমন একটা গাম্ভীর্য এসেছে। যেন তার বয়স অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাকে দেখা মাত্র এক মুহূর্তে নারীমণ্ডলীর প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে গেল ঃ

—যাই ভাই, বাড়িতে এতক্ষণ বোধ হয় কুরুক্ষেত্তর বেধে গেছে। মরণ হয় তো বাঁচি।

—দিনের তরকারি আর এক ফোঁটা নেই। যাব, গিয়ে উনুন ধরাব, ছুখানা কুমড়ো-ফুলের বড়া ভাজব, তবে মানুষের পাতে ভাত দিতে পাব।

—আর মা, মাছের একটা ডাক নেই গো! নিরিমিষ্যি খেয়ে খেয়ে যে মলাম।

—আমাদের তো যক-শক মা, ছেলেগুলো খেতে বসে কেঁদে মল। না মাছ, না তরকারি।

—আর বলো না ভাই। আমাদের ডাঙাটায় ছুটো কুমড়োর জালি ধরেছিল। তা কি থাকবার যো আছে? মুখপোড়া হনুমান কখন এসে তুলে নিয়ে গেছে।

—যা বলেছ ভাই। ওই মুখপোড়ার দৌরাত্ম্যিতে কিছু কি লাগাবার যো আছে?

বিনোদিনী আস্তে আস্তে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। সকলের দিকে চেয়ে ম্লানভাবে একটু হাসল।

—এস ভাই।

—এত দেরি হল যে!

—উঠলাম ভাই! গিয়ে আবার উনুন ধরাতে হবে।

—আর বল কেন!

দেখতে দেখতে সকলে উঠে চলে গেল। বিনোদিনী বুঝলে, তার মুখ পুড়েছে। রসিকের স্ত্রী বাকি কিছু রাখেনি। সে আসা মাত্র যারা উঠে গেল—কেউ একটা মুখের সম্ভাষণ করে, কেউ বা তাও না করে—এদের সকলেরই কিছু কাজের তাড়া নেই। গৃহস্থের কুলবধূ, তার অশুচি সংস্পর্শে পাছে সংসারের অকল্যাণ হয়, সেই ভয়ে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই অত তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। কলরবমুখর স্নানের ঘাট খালি হয়ে গেল। রইল কেবল রতনমণি। বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘড়া নামিয়ে বসল।

রতনমণি তার নিজের জীবনে অনেক পোড় খেয়েছে। বিনোদিনীর নিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বুঝলে, প্রথম আঘাতটা তাকে খুব জোর লেগেছে। সামলে নেবার জন্যে রতনমণি তাকে একটু সময় দিলে। সে নিঃশব্দে গামছা দিয়ে পায়ের ময়লা সাফ করতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চাইতেই রতনমণি দেখলে নদীর ধার দিয়ে বৃন্দাবন যাচ্ছে হন হন করে। বৃন্দাবনকে তার কোনো দরকারই ছিল না। বস্তুতপক্ষে বহুকাল তার সঙ্গে রতনমণির একটা কথাও হয়নি। একদা প্রথম যৌবনে তার জীবনে বৃন্দাবন এসেছিল অত্যন্ত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে। আবার একদিন সে বিদায়ও নেয় তেমনি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে। নিজের জীবন থেকে তার চিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে রতনমণিকে কোনো আয়াস স্বীকার করতে হয়নি। প্রেমের জগতে এরা হল মুসাফিরধর্মী। কোথাও স্থায়ীভাবে নীড় বাঁধে না। কাশী থেকে মথুরা, সেখান থেকে হরিদ্বার। নতুন নতুন আবেষ্টনী। যখন যেখানে থাকে আশ্চর্য রকম তারই রঙ নেয়। নব নব ঠাঁই থেকে নব নব রস নেয় অত্যন্ত সহজে। বৈচিত্র্য নইলে এরা এক দণ্ডও বাঁচতে পারে না। বৃন্দাবনের সম্বন্ধে এক মিনিট পূর্বেও ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সহধর্মীর সান্নিধ্যের বোধ হয় একটা মোহিনী শক্তি আছে। বিনোদিনী তার

দিকে একরকম পিছন ফিরেই বসে আছে। নিঃশব্দে। কিন্তু তার উপস্থিতিতেই ওর মনে বিন্দু বিন্দু করে রস জমেছে অজ্ঞাতসারে। এমন সময় বৃন্দাবনকে দেখেই মনে হল, ওর সঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। বিনোদিনী? বিনোদিনীকে আর সমীহ করার কি আছে! আজ থেকে সে তো তারই সমশ্রেণীতে এসে দাঁড়াল। রতনমণি হাত-ইশারায় বৃন্দাবনকে দাঁড়াতে বললে।

বৃন্দাবন অবাক হয়ে গেল। বহুদিন পরে রতনমণি তাকে ডাকলে। কেন ডাকলে কে জানে! হয়তো কোনো দুঃখে পড়েছে। কিছু চাইবে হয়তো। দেবার মতো তারও তো আর কিছু নেই, এক খেতের ফসল ছাড়া। সেও তো এখন পথে দাঁড়িয়ে। বৃন্দাবন ভয়ে ভয়েই একটা করবী গাছের আড়ালে দাঁড়াল। রতনমণি থেকে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে সত্য, কিন্তু ওর সম্বন্ধে এখনও সে করুণার ভাব পোষণ করে। দীর্ঘকাল একত্রবাসের ফলে যে মমতা জেগেছিল তা এখনও যায়নি। রতনমণি কিছু চাইলে 'না' বলবার শক্তি তার নেই।

রতনমণি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। তার কাপড় স্থানে স্থানে ভিজে অঙ্গের সঙ্গে লেগে গিয়েছে। বৃন্দাবন দুরু দুরু বক্ষে চেয়ে দেখলে—শুধু মমতা নয়, ওর সম্বন্ধে পুরাতন অনুরাগ এখনও মরেনি। ও যেন আজকে আবার নতুন করে তার আকাশে উদয় হল। ওর চলায় ফিরে এসেছে আবার সেই কিশোরীকালের ছন্দ। চোখে-মুখে জেগেছে প্রথম যৌবনের মদির চঞ্চলতা। ক্ষণে ক্ষণে খসেপড়া অঞ্চলে আবার লেগেছে আগেকার মতো বসন্ত-বায়ুর আকুলতা। ঠোঁট দুটিতে ডালিম ফুলের মত হাসি। সেই করবী গাছের অন্তরালে বৃন্দাবনের পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বিনোদিনী কিছুক্ষণের জন্যে হতবুদ্ধির মতো বসে রইল। বৃন্দাবনের সঙ্গে রতনমণির সম্পর্কের কথা তো বিলাতের লোকেও জানে। কিন্তু তার সামনে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, দুজনে এমন ঘনিষ্ঠভাবে রসালাপ করতে পারে, এত বড় স্পর্ধা রতনমণি কি করে সংগ্রহ করলে তাই ভেবে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাগে তার সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। অথচ কৌতূহলও দমন করতে পারছিল না। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে রতনমণি দুহাত দিয়ে বৃন্দাবনের একখানা হাত ধরে ধীরে ধীরে দোলাচ্ছে। যৌবনের প্রান্তে এসে তার দেহ স্থূল হয়েছে। রসের ভারে সেই স্থূল দেহই তরঙ্গের মতো দুলে দুলে উঠছে। আর তার পরিচ্ছন্ন দন্তপাতি, আয়ত চোখ, আঙুলের পালিশ-করা আঙটি থেকে থেকে ঝিলিক মারছে। কথা শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কেবল অস্পষ্ট হাসির হিল্লোল কানে আসছে, পাখির কূজনের টুকরোর মতো।

বিনোদিনীর গলায় যেন কি একটা আটকে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বুকের স্পন্দন যেন মাঝে মাঝে বন্ধ হবার মতো হচ্ছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন গরম বাষ্প নির্গত হচ্ছে। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল।

তার জীবনে প্রেম কোনোদিন এমন করে আসেনি। এমন নিস্তব্ধ নদীতীর, ছায়াচ্ছন্ন করবী গাছের অন্তরাল, সুশীতল গোধূলিবেলা, পতঙ্গের গুঞ্জরণের মতো অস্পষ্ট কথা—এমন আনন্দ সে জীবনে কোনোদিন আস্বাদ করার সুযোগ পায়নি। নিতান্ত ছেলেবেলায় এসেছিল ললিতার দাদা। এখন মনে হয় সে নিতান্তই ছেলেখেলা। তার মধ্যে খেলা ছিল প্রচুর, ছেলেমি ছিল প্রচুর, চঞ্চলতাও ছিল প্রচুর। কিন্তু এই আগুন সেদিন কোথায় পাবে? কামনার এই উগ্রতা? তখন তো রসভারে এমন স্বরভঙ্গ হত না? দুজনের পক্ষে পৃথিবীকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণও বোধ হত না। আবার ছোট একটি করবী গাছকে আশ্রয় করে পৃথিবী থেকে এমনি বিচ্ছিন্ন হওয়ারও সাহস হত না।

তারপরে মনের মধুচক্রের খোপে খোপে যেদিন কোথা থেকে বিন্দু বিন্দু করে মধু এসে জমতে লাগল, সেদিন জীবন থেকে বৈচিত্র্যও যেন কোথায় উবে গেল। বিপুলা পৃথিবী সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু মনোরম হল না। ভালবাসা যেন ডাল-ভাতের মতো সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হল। তার মধ্যে না রইল কামনার উগ্রতা, না রইল মানসিক প্রীতির স্নিগ্ধতা। না রইল দিবসের তীক্ষ্ণতা, না রইল রাত্রির গাঢ়তা। দিনের পর দিন তারা একত্রে কাটিয়ে দিতে লাগল। তার মধ্যে মিলনও নেই, বিরহও নেই। না পূর্ণিমা, না অমাবস্যা।

ময়ূরাক্ষীর সুশীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেও যেন বিনোদিনীর দেহের উত্তাপের হ্রাস হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, গায়ে-মাথার কাপড় খুলে ফেলে প্রত্যেক লোমকূপ দিয়ে এই সুশীতল জল পান করে। তবে তো সে সুস্থ হতে পারে। কিন্তু গৃহস্থ ঘরের বধূ, পাশেই লোক চলাচলের রাস্তা, তার উপর অনতিদূরে বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে রতনমণির সঙ্গে রসালাপ করছে। দেহের বসন এতটুকু স্থান ভ্রষ্ট হলে চলবে না। বিনোদিনী ঘোমটার মধ্যেই মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগল। মনে হল চোখটা যেন অনেক স্নিগ্ধ হল।

একটু পরে বৃন্দাবন চলে গেল শিষ দিতে দিতে। হঠাৎ তার মনে স্ফূর্তি এসে গেছে। রতনমণি হেলতে দুলতে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বিনোদিনীর গা ঘেঁষে বসল। বিনোদিনী একটু সরে যাবার চেষ্টা করতেই সে তাকে জড়িয়ে

ধরে তার মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে মুখে চোখে কপালে কপোলে চিবুকে অজস্র চুমু খেতে লাগল। বিনোদিনীর সারা দেহ হঠাৎ যেন এলিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নদীপাড়ের বটবৃক্ষে একটি দুটি করে পাখিরা নীড়ে ফিরে আসছে। আউশ ধানের মঞ্জরীগুলি সোনালী আলোর তরঙ্গে দুলছে। দূরে এক খণ্ড কালো মেঘের কোল ঘেঁষে চলেছে মুক্তার হারের মতো বকের শ্রেণী। দু-চারিটি মধুকুলকুলি পাখি এখনও নোনা আতার লোভ সামলাতে পারেনি। পাশের আতা গাছের ঝোঁপের মধ্যে এখনও তারা কিচ কিচ করছে। আর ঘরে ফেরার সময় হয়নি ভ্রমরগুলির। তারা এখনও আকন্দ ফুলের চারি পাশে ঘুরছে, আর গুন গুন করছে। বনফুলের মধুপানের আশা এখনও মেটেনি তাদের।

জলের মধ্যে বিনোদিনীর দেহ শোলার মত পাতলা হয়ে গিয়েছে। ভয় হল নদীর স্রোতে এখনই বুঝি সে ভেসে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি রতনমণিকে জড়িয়ে চেপে ধরলে।

স্খলিত কণ্ঠে বললে, ওকি ভাই!

রতনমণি চোখে একটা কটাক্ষ হেনে বললে, কি হল?

বিনোদিনী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। রতনমণিকে ছেড়ে দিয়ে শুধু বললে, ছিঃ! চল উঠি।

রতনমণি তেমনি করে হাসতে হাসতে বললে, এরই মধ্যে? দাঁড়াও, সন্ধ্যে হোক।

বিব্রতভাবে বিনোদিনী বললে, না ভাই, আমার অনেক কাজ আছে। ছাড়, আমি যাই।

রতনমণি হাসতে হাসতে বিনোদিনীর আঁচল চেপে ধরে শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল।

বৃন্দাবন তখনও বেশী দূর যায়নি। তার ভাঙা ভাঙা গলার গান শোনা গেল:

> বাঁকা শ্যাম হে তোমার বাঁশী কেড়ে নোব।
> তোমার বাঁশী বাজান, কুল মজান, এইবারে ঘুচাব।

সেই ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে তাললয়হীন গান শুনে বিনোদিনী হেসে ফেললে। রতনমণিও।

ঠোঁট টিপে হেসে রতনমণি বললে, গান কি আর ও গাইছে?

—তবে?

—রোগে গাইছে

বিনোদিনী হেসে বললে, তা জানি। নইলে পটলার বাপের মুখে গান কোনোদিন শুনিনি।

রতনমণি আপনার কৃতিত্ব-গৌরবে হাসতে হাসতে মুখ দিয়ে জল ছুঁড়ে রামধনু সৃষ্টি করতে লাগল।

একটু পরে এদিক ওদিক চেয়ে রতনমণি বললে, কেউ তো কোথাও নেই, যাবি একটু সাঁতার দিতে?

বিনোদিনীও এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে কেউ নেই বটে। কিন্তু তার ভয় হচ্ছিল।

বললে, না ভাই। অনেক দিন অভ্যেস নেই, যদি···

—অভ্যেস আবার কি! ঘড়া নিয়ে যাব ···

—যদি ভেসে যাই? বিনোদিনী হাসলে।

রতনমণি স্নেহভরে তার গাল দুটি টিপে দিয়ে বললে, যা না ভেসে বৌ। আমি তারাপদকে পাঠিয়ে দোব, সে এসে তোকে এক গোছা পদ্মফুলের মতো সাঁতরে বুকে করে তুলে নিয়ে আসবে। হবে তো তা হলে?

বিনোদিনী এক মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ তার যেন কি হয়েছিল। যেন জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। যেন স্বপ্ন দেখছিল। সে যে কে, কোথায়, কি করছে আর তার হুঁশ ছিল না। রতনমণির একটা কথায় স্বপ্নের কুয়াশা গেল কেটে। বিনোদিনী সোজা হয়ে দাঁড়াল, সাপের মতো ফণা তুলে।

বললে, সেই কথাই রাষ্ট্র হয়েছে না কি?

তার মূর্তি দেখে রতনমণির মনে মনে ভয় হল। এই তো কেমন হাসছিল। এ আবার কি!

কিন্তু তবু সে ভড়কে গেল না। মুখখানি হাসি হাসি করে বললে, হলই বা!

বিনোদিনীর স্ফীত নাসিকা দিয়ে ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস বইছিল। বিস্ময়ে ও ক্রোধে চোখ বিস্ফারিত করে বললে, হলই বা! গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝির নামে যা খুশি রটাবে?

রতনমণি তবু যেন কথাটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে বললে, তা রটাক।

—রটাক? কোন্ শতেকখোয়ারি রটাচ্ছে শুনি? কার বেটা গো-ভাগাড়ে গেল? মুখ যে খসে পড়বে? এখনও চন্দ্র সূয্যি উঠছে। এখনও দিনরাত্রি হয়।

বিনোদিনী যে গলায় হারাণের সঙ্গে ঝগড়া করে, সেই গলায় এই নিস্তব্ধ নদীতীরে চীৎকার করতে লাগল।

রতনমণি তাড়াতাড়ি তাকে থামিয়ে বললে, আ মল ছুঁড়ী! তা আমার কাছে ঝগড়া করে কি হবে? যারা বলছে, সে তো জানিস। তাদের কাছে যা।

বিনোদিনী কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে বললে, যাব না? তাদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তবে ছাড়ব।

রতনমণি তার মৃণালের মতো একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলে। চুপে চুপে সান্ত্বনার সুরে বললে, ঝগড়া করে কার মুখ বন্ধ করবি বৌ, তার চেয়ে চেপে যাওয়াই ভালো। এই তো আমার পেছনে গাঁ ষোলো আনা লেগেছিল। কী করতে পারলে? কেউ কি সমাজে পতিত করতে পারলে?

রতনমণি কি বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিনোদিনী ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল।

চোখের কোণে হাসির ঝিলিক মেরে রতনমণি আরও গাঢস্বরে বলতে লাগল, প্রথম যেদিন ধরা পড়লাম আমারও এমনি হয়েছিল বৌ। ভেবেছিলাম সর্বনাশ হয়ে গেল। লোকের কাছে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না। আমিও এমনি কেঁদে আর বাঁচি না। আবার দুদিনে সয়ে গেল। ভগমান মানুষকে মুখ দিয়েছেন, বলুক। কদিন বলবে? গায়ে তো আর ফোস্কা পড়বে না।

রতনমণি আনন্দের আতিশয্যে খিল খিল করে হেসে উঠল।

তার হাসি শুনে বিনোদিনী শিউরে উঠল। বললে, কিন্তু এ সব যে মিথ্যে কথা ঠাকুরঝি! তারাপদ…

রতনমণি তাকে একটা ঠেলা দিয়ে ভুরু বেঁকিয়ে বললে, নে, ঢঙ রাখ। আমার কাছে আর গোপন করতে হবে না। দেখলি তো, আমি তোর কাছে কিছু গোপন করলাম?

এবারে বিনোদিনী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। চীৎকার করে বললে, এ কথা হলাহল মিথ্যে ঠাকুরঝি। তারাপদ আমার ছোট ভাইএর মতো, আমার পেটের ছেলের মতো। এই সন্ধ্যেকালে, এক গলা জলে দাঁড়িয়ে দিব্যি করছি, এ যদি সত্যি হয় আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে, মুখ যেন খসে যায়, আমার একমাত্র ছেলে যেন চোখের সামনে ধড়ফড় করে মরে যায়, আমার…

রতনমণি তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরলে। বললে, ছিঃ! এই সন্ধ্যেকালে ছেলের দিব্যি করে হতভাগী!

বিনোদিনী তখনও হাঁফাচ্ছিল। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছিল।

কথা যেন আর বেরুচ্ছিল না। থেমে থেমে, কেটে কেটে বললে, আর কার দিব্যি করব ঠাকুরঝি! আর কি দিব্যি করলে তোমরা বিশ্বাস করবে বল।

বিনোদিনী থর থর কাঁপছিল। ওর অবস্থা দেখে রতনমণির ভয় হল। নির্জন ঘাট। কোথাও জনপ্রাণী নেই। যদি কিছু ওর হয়, তার পক্ষে সামলানো কঠিন।

রতনমণি তাড়াতাড়ি ওকে কোলের মধ্যে টেনে নিলে। ভিজে কাপড় দিয়ে ওর চোখ-মুখ, কপালের রগ ত্নটো মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, আর কোনো দিব্যি করতে হবে না বৌ। আমি বিশ্বাস করেছি। নির্দোষীর নামে যারা কলঙ্ক রটাচ্ছে ভগমান তাদের শাস্তি দেবেন।

চোখে মুখে শীতল জলের স্পর্শে বিনোদিনীর শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ হচ্ছিল। কিন্তু বুকটা তখনও ধড়ফড় করছিল। সন্ধ্যাবেলায় ছেলের দিব্যি করেই সে শিউরে উঠেছিল। তাদের দেখবার জন্যেও হঠাৎ তার মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বললে, আর নয় ভাই, চল।

—হাঁ চল।

রতনমণিরও বিনোদিনীকে নিয়ে একা ঘাটে থাকতে কেমন একটা অজানা ভয় করছিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

পথে চলতে চলতে বললে, কিচ্ছু ভয় করো না বৌ। সতীলক্ষ্মীর নামে মিছে কলঙ্ক যে দেবে তার কখনও ভালো হবে না। আমি না জানি কি বৌ। দেখি না কোন্ শতেকখোয়ারি কি বলে? ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে ছাড়ব না? রসিকের বৌএর বুকের পাটা বড় বেড়েছে, না? আমার কাছে চালাকি খাটবে না।

বিনোদিনী ওর পিছু পিছু নিরুত্তরে পথ চলছিল। তার জবাব দেবার শক্তিও ছিল না। বুকের ভিতরটা কেমন আঁকুবাঁকু করছিল। কেবল যেন দম ফুরিয়ে ফুরিয়ে আসছিল। কোনো রকমে এইটুকু পথ গিয়ে বাড়ি পৌছতে পারলে যেন বাঁচে।

রতনমণি আপন মনেই বলতে বলতে চলেছে:

—আমার আর কারও হাঁড়ির খবর জানতে বাকি নেই বৌ। কে কি দিয়ে ভাত খায় আমি চোখ বুজে টের পাই। বড় যে ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গে রস করতে গিয়েছিলি। ননদ দিলে তো মুখে লাথি মেরে রস বা'র করে? ঢলানি কোথাকার?

বিনোদিনী কথা কইতে পারছিল না। বহু কষ্টে জিজ্ঞাসা করলে, কে ঠাকুরঝি?

—সে কাল শুনবি। রাম-রাত পোয়াক। তারপরে কি করে পাট করি দেখিস। আয় বৌ!

—এস।

রতনমণি ওদিকের রাস্তায় চলে গেল। বিনোদিনী এদিকের রাস্তায়। আর ক-পা গেলেই তার বাড়ি। সামনেই বারোয়ারিতলা। মোড় ঘুরলেই নটবর ঘোষের গোয়ালবাড়ি। তারপরে একটা ডোবা। তারপরেই ওদের বাড়ি। বিনোদিনীর মাথা ঝিম ঝিম করছিল, পা টলছিল, বুকের ভিতরটা কেমন করছিল। তবু ভরসা হল, টেনে-হেঁচড়ে এটুকু পথ সে পায়ে পায়ে খুব যেতে পারবে।

ছয়

সন্ধ্যা হয়ে এল।

মশা তাড়াবার জন্যে নটবরের গোয়ালঘরে ভিজে খড় জ্বালিয়ে সাঁজাল দেওয়া হয়েছে। খড়ের চালের ভিতর দিয়ে এত প্রচুর ধোঁয়া বেরুচ্ছে যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কিছু ধোঁয়া এদিকের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে ডোবার দুর্গন্ধ জলের উপরে উপরে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল। পাশের ঘেঁটুবনে মশা ভনভন করছে। ফেরার সময় হয়েছে দেখে ডোবার জলে হাঁসগুলি তাড়াতাড়ি বারে বারে ডুবে সান্ধ্যভোজন শেষ করে নিচ্ছিল। দূরে কাদের গোয়ালঘরে একটা গরু ক্রমাগত হাম্বা হাম্বা করছিল। বোধ হয় তার বৎসটি এখনও ফিরে আসেনি। হয়তো কারও ফসল খেয়েছিল; সে ফাঁড়িতে দিয়েছে। নয়তো দলভ্রষ্ট হয়ে ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক ঘুরে মায়ের অন্বেষণ করছে। জন্তুরা বোধ হয় অন্ধকার পছন্দ করে না। তাই নানা স্থানে নানা জন্তু আসন্ন সন্ধ্যার আগমনের তীব্র প্রতিবাদ তারস্বরে জানাচ্ছিল। গ্রামের মধ্যে থাকলে এই সংমিশ্রিত কলরব তত কানে লাগে না। কিন্তু শান্ত সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ নদীতীরে দাঁড়ালে মনে হয় গ্রামে যেন মেছোহাট বসেছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যার কোনো মর্যাদাই রাখতে ওরা প্রস্তুত নয়।

ডোবার ধার থেকে এইটুকু পথ বিনোদিনী কি করে এল, তা সে নিজেও বলতে পারে না। বাড়ি এসে দেখে গোলার নীচে উঠোনে ছেলেটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে।

বিনোদিনীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। কাঁখের ঘড়া দুম করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও আছড়ে পড়ল।

হারাণ মাঠ থেকে সেই মুহূর্তে ফিরল। ঘড়া এবং বিনোদিনীর পড়ার শব্দে সে ছুটে এল। হাবলও সে শব্দে উঠে বসে চোখ রগড়াচ্ছে আর মায়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। কি যে ব্যাপারটা হল তাই সে বুঝতে পারছে না।

—কি হল? কি হল?

হারাণ ছুটে এসে বিনোদিনীকে হাত ধরে তুলতে গেল। কিন্তু কে উঠবে? বিনোদিনীর দুটো পা শক্তভাবে পরস্পর জড়িয়ে গেছে। হাতের মুঠি বন্ধ। বড় বড় লাল চোখের তারা ভাঁটার মতো এমন করে ঘুরছে দেখলে ভয় লাগে।

বিনোদিনী উঠোনময় ছটফট করছে আর মুখ ঘষছে। ফলে ঠোঁট আর হাতের মুঠি দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে।

হারাণ চাৎকার করে উঠল। তা দেখে ছেলেটাও। পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সে চীৎকারে ছুটে এল :

—কি হল ? সাপে কামড়েছে ?

—অত রক্ত কিসের ?

—এবারে সাপের সংখ্যে এত বেড়েছে !

—বাড়বে না ? গঙ্গাপুজোর দিন জল হয়েছে যে !

—ওহে হারাণ, কোথায় কাটল ? হাতে না পায়ে ? রক্তটা যেন হাত থেকেই বেরুচ্ছে মনে হচ্ছে !

কোনো কথাই হারাণের কানে যাচ্ছে না। সে মাথার চুল ছিঁড়ছে, আর চারিদিকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। কেবলই বলছে, সর্বনাশ হয়ে গেল! সর্বনাশ হয়ে গেল ! বাস্তু সাপ যখন মারা গেল তখনই জানি অনর্থ একটা ঘটবে !

বিনোদিনীর সেই একই অবস্থা। তার গায়ে মাথায় কাপড়ের টুকরো পর্যন্ত নেই। মুখ থেকে একটা অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। আর কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে রতনমণি এল।

বিনোদিনীর অনাবৃত অবস্থা দেখে সে আগেই পুরুষদের দিলে তাড়া :

—মেয়ে মানুষের অসুখ করেছে, তার গায়ে মাথায় কাপড় নেই, বেটাছেলেরা এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছে ? লজ্জা করে না ?

রতনমণির মুখকে সবাই ভয় করে। তারা যেন বিনোদিনীর অনাবৃত অবস্থাটা এই মাত্র উপলব্ধি করলে এমনি ভাব দেখিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। কিন্তু সে যে কত বড় অনিচ্ছার সঙ্গে তা তাদের এক পা করে বাইরের দিকে যাওয়া আর ফিরে চাওয়া দেখলেই বোঝা যায়।

রতনমণি হারাণকে ডাকলে। নিজে বিনোদিনীর সংজ্ঞাহীন দেহের পায়ের দিকে ধরল, আর হারাণ ধরলে মাথার দিক। এমনি করে শুকনো কর্কশ উঠোন থেকে তাকে তুলে ধরে দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে।

মেয়েদের মধ্য থেকে একজন আর একজনকে এক গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হেনে ফিস ফিস করে বললে, বিষ খায়নি তো ?

—কে জানে মা !

কথাটা তাদের মনঃপূত হল। আজ সে যেভাবে ধরা পড়েছে তাতে আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে বিষপান করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এমন কি ও-কালামুখ জনসমাজে দেখানোর চেয়ে বিষপান করাই শ্রেয়।

কথাটা রতনমণির কানে যেতেই সে একেবারে ফোঁস করে উঠল। কথাটা কে বললে তা সে বুঝতে পারলে। কিন্তু তার দিকে না চেয়েই বললে :

—বালাই ষাট! ও সতীলক্ষ্মী কি দুঃখে বিষ খাবে? যাদের কালামুখ তারা খাক। পিরথিমি জুড়ুবে।

কিন্তু হারাণ নির্বিকার। কে কি বলছে, কে কি করছে তা তার কানেও যাচ্ছে না, চোখেও পড়ছে না। অবশ্য বয়স তার হয়েছে। তবু এখনও দেহে শক্তি কম নেই। লাঠি ধরলে এখনও সে বহু লোকের মহড়া নিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর এই অসুখে সে যে কত অসহায় তা এই প্রথম উপলব্ধি করলে। কেউ যদি এ সময় কোনো দুষ্কর কাজের ভার দেয় সে হাসতে হাসতে তা করতে পারে। কিন্তু এ যে কিছুই করবার নেই। কী রোগ, তাই তো জানা গেল না। এই অনিশ্চিত অবস্থার জন্যেই সে আরও ছটফট করতে লাগল!

ইতিমধ্যে কখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তাই কারও খেয়াল হয়নি। ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়নি। চৌকাঠে জল পর্যন্ত কেউ দেয়নি। রতনমণির তা লক্ষ্য পড়ল।

হারাণকে বললে, অমন করে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? সাঁঝ জ্বালতে হবে না? ঘরে-দোরে জল ছিটুতে হবে না? অন্ধকার হল যে!

একটা কাজ পেয়ে হারাণ বেঁচে গেল। বিনোদিনীর কাতরানি সে আর চোখে দেখতে পারছিল না। বুক ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখানোর কাজ তার নয়। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে প্রদীপটা কোনোরকমে পেলে, তাও হাতে লেগে খানিকটা তেল পড়ে গেল। কিন্তু দেশলাইটা যে বিনোদিনী কোথায় রেখেছে কিছুতে খুঁজে পেলে না। অন্ধকারে হাতড়ানো, একবার দেওয়ালে মাথা ঠোকে, লোহার একটা কিসে লেগে হাত কেটে যায়।—হারাণ বিনোদিনীর অসুখের কথা ভুলে গিয়ে তার উপর চটেই গেল।

আপন মনেই বিড় বিড় করে বললে, মাগী কোথায় যে কি রাখে! একটা জিনিস যদি সময়ে পাওয়া যায়!

দেশলাইএর আশা ছেড়ে দিয়ে হারাণ চকমকি বের করলে। বাইরে সাংগায় একটা চটের থলিতে তামাক খাবার সরঞ্জাম থাকে। একমুঠো খড় নিয়ে এসে দুটি

পাকালে। চকমকি ঠুকে শোলা ধরিয়ে সেই শোলার আগুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে খড় ক'টা জ্বালালে। তাই থেকে প্রদীপ ধরিয়ে সন্ধ্যা দেখালে।

উপস্থিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে একদল রতনমণির কথা শুনে চুপ করেছে। ওকে ঘাঁটানো ঠিক নয়। এখনই কি কথায় কি কথা উঠবে কে জানে! কিন্তু পিছনের দলের গুঞ্জন তখনও থামেনি :

—কত ছলা-কলাই জানে!

—ঢলানি!

—বুড়োকে একেবারে ভেড়া বানিয়েছে গো!

—মাথায় হাত দিয়ে কেমন করে বসেছে দেখ না!

—মরণ আর কি!

—তবু যদি সোয়ামীর ওপর বৌএর ছেদ্দা থাকত!

—হ্যাঁ। দিনে দশবার মুখে লাথি মারছে!

—আর সন্ধ্যেবেলা নাগর নিয়ে···

—থাম ছুঁড়ী!

মেয়েদের মধ্যে চাপা হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল। কে কাকে থামায়? সবাই মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হাসে।

বিনোদিনীর অবস্থা যেন অনেকটা শান্ত হয়ে এল। কাতরানিটা গেছে। শ্বাসকষ্টও অনেকখানি কমেছে। সেই অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে। বোধ করি ঘুমই বা এল।

রতনমণি ওর চোখে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

পুরোভাগের স্ত্রীলোকগুলি আশ্বস্ত হয়ে বলতে লাগল, যাক বাবা! কি ভয়ই হয়েছিল!

—কেন অমন হল কে জানে!

—ভর সন্ধ্যেবেলায় তেঁতুলতলার নীচে দিয়ে সটর-পটর করে আসা! ও কি সামান্যি তেঁতুল গাছ না কি!

—তাই হবে মা, ভর সন্ধ্যেবেলায় আসাই বটে!

—ও রতনমণি, ভিজে কাপড়খানা এই বেলা ছাড়িয়ে নাও না মা। গায়ে জল বসছে!

রতনমণি শান্তভাবে বললে, আর একটু সুস্থ হোক।

সকলে বিনোদিনীর আর একটু সুস্থ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

পশ্চাদ্ভাগের স্ত্রীলোকদের মধ্যে তখন অন্য প্রকার আলোচনা চলছিল :

—শ্রীমতীর মূর্চ্ছো দিদি ! ভাগ্যে বিন্দে দূতী এসেছিল তাই ভাঙল !

—কিন্তু কেষ্ট ঠাকুর কই ! মাথার শিয়রের কাছে এসে বসুক একবার !

—হাঁ ভাই। আমরাও দেখে নয়ন সার্থক করি !

সঙ্গে সঙ্গে সকলের গিটকিরি দিয়ে হাসি।

হারাণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনী আবার একটা অব্যক্ত শব্দ করে পাশ ফিরল। উন্মুক্ত করতল আবার বন্ধ হয়ে গেল। পায়ে পায়ে আবার লাগল ছাঁদ। গোল গোল চোখের তারা আবার ঘুরতে লাগল। একটা ঝাপ্টা মেরে রতনমণিকে দিলে উল্টে ফেলে। হারাণ ছুটে গিয়ে বিনোদিনীকে ধরলে। কিন্তু তার মতো জোয়ানও একটি সামান্য স্ত্রীলোককে সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেল। ভয়ংকটি সাপের মতো বিনোদিনী কেবলই সোজা হয়ে উঠতে যায়। শ্বাসকষ্টের জন্যে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নাক এবং ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফেনা ভাঙছে। এর উপর আবার অসংবদ্ধ প্রলাপ আরম্ভ হল :

—আমি যাব না তো···কিছুতেই যাব না···হুঁ দেখি না কি কর তুমি !···ভয় কি ! এই যে এসেছি···হুঁ ··কদমতলায় বাঁশী বাজাচ্ছে···শ্যাম আমার বাজায় বাঁশী কদমতলায়···(হাসলে)···একটা গান কর না ভাই···ও ললিতা, কোথায় গেলি···হুঁ···যমুনাতে জল আনিতে যাব না লো সই, যমুনাতে হুঁ···ওদিকে যাচ্ছিস কেন ?···আরে মল···

এবার সত্যিই সকলের ভয় হল। রতনমণিও আর ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করলে না। আচমকা উল্টে গিয়ে তার কনুইটা ছিঁড়ে গেছে। চিন চিন করে জ্বলছে। অন্যমনস্কভাবে সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে বিস্ফারিত চোখে বিনোদিনীকে দেখতে লাগল। মনে হল, সকলেরই মনে হল, এ নিশ্চয়ই তেঁতুলতলার তাঁরই কাজ। নইলে এ ভুল বকুনি কিসের ?

নদীর ঘাট থেকে গ্রামে ঢুকতেই তেঁতুল গাছটা। তারই তলা দিয়ে চলবার রাস্তা। ঘন পত্রবহুল বিশাল তেঁতুল গাছ। স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে পাতা ধরেছে। নীচের স্তরে গাঢ় সবুজ পাতা, পরের স্তরে টিয়া সবুজ, তার পরের স্তরে আরও ফিকা। সজল মেঘের পটভূমিকায় এই গাছটিকে দেখলে চোখ জুড়োয়। মেঘের ছায়ায় বৃষ্টি-ধোয়া পাতার বর্ণ-বৈচিত্র্য চোখে এবং মনে স্নিগ্ধতা আনে। কিন্তু এই বর্ণ-সুষমার অন্তরালে যিনি থাকেন তাঁর মধ্যে মাধুর্যের চিহ্নমাত্র নেই ! তাঁর রূপমাধুরী স্বচক্ষে কেউ দেখেনি। দেখার ইচ্ছাও কারও নেই। কেবল

কেউ কেউ দেখেছে, চাঁদিনী রাত্রে কে যেন একখানা ধপধপে সাদা কাপড় চাঁদের আলোয় শুকোতে দিয়েছে। এ প্রমাণ দেখার চেয়ে কম বড় প্রমাণ নয়। দুপুর রাত্রে তেঁতুল গাছে আর কে কাপড় শুকোতে দিতে পারে! এর চেয়ে বড প্রমাণও অবশ্য আছে। কিন্তু সেই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর কেউই এখন জীবিত নেই। গ্রামের যেসব অতি বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছে, তারা তাদের ছেলেবেলায় প্রত্যক্ষদর্শীদের নিজের মুখ থেকে শুনেছে যেসব কাহিনী, তাও কম প্রামাণ্য নয়। এ নাকি চোখেই দেখা গিয়েছে (অবশ্য দূর থেকে) যে, শীতকালের শেষে যখন ঝড় দেয় তখন কে যেন তেঁতুল গাছ থেকে সশব্দে জটা নাড়া দিচ্ছে। আরও নাকি দেখা গিয়েছে যে, অমাবস্যা রাত্রে তেঁতুল গাছ থেকে কার যেন দুটি দীর্ঘ শীর্ণ পা বেরিয়ে এসে ডোবার ওপারে বাঁশ ঝাড়গুলি নাড়া দিয়ে দোলাতে লাগল। ওই ডোবার ধারে বহুকাল পূর্বে এক ঘর অধিকারী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এখনও তাঁদের পোড়ো ভিটার চিহ্ন আছে। ডোবাটিকেও এখনও লোকে অধিকারীর ডোবা বলে। বাঁশ গাছ দোলানোর দৃশ্য তাঁরাই দেখেছিলেন। তার ফলে পট পট করে সবংশে নিধন হলেন। তেঁতুল গাছে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ বড় কম অকাট্য প্রমাণ নয়। অধিকারীদের বংশ যে নির্মূল হয়ে গিয়েছে এ তো সব চোখেই দেখতে পাচ্ছে। যদি তাঁরা অমন দৃশ্য না-ই দেখবেন তবে অমন হবেই বা কেন?

সেই থেকে কোনো মেয়েই সন্ধ্যার পর ও পথে একা হাঁটে না। যুবতী মেয়ে তো নয়ই। বিশেষ, ভর সন্ধ্যাবেলাটাই না কি অপদেবতার পক্ষে নরদেহ আশ্রয় করার প্রকৃষ্ট সময়। দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে না কি ওঁদের শক্তির স্ফুরণ বেশী হয়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ ওঁর মিলে গিয়েছে। তা ছাড়া বিনোদিনীরও অপরাধ কম নয়। রতনমণির এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, বিনোদিনী নিশ্চয়ই ভুলে ভুলে নিজের অজ্ঞাতসারেই এই অপরাধ করে ফেলেছে। কারণ ওখানে যে থুতু ফেলতে নেই এ কথা একটা বালকেও জানে, বিনোদিনী তো জানেই। কিন্তু ফেলেছে। আর আগুনে না-জেনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না? আগুনের ধর্মই হাত পোড়ানো।

কথাটা শুনে সকলেই গালে হাত দিলে।

যারা ইতিপূর্বেই তেঁতুলতলার ইঙ্গিত করেছিল তারা একবাক্যে বললে, তখনই বলেছিলাম!

রতনমণি আগেই অনেকটা সরে পড়েছিল। এখন একেবারে হাল ছেড়ে দিলে। যেন এতক্ষণ তার হাতেই বিনোদিনীর জীবনের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হাত ঝেড়ে রত্নমণি বললে, ওঝা ডাক হারাণদা। এ রোগ মানুষের অসাধ্যি।

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলে।

হারাণ ছুটল ওঝার কাছে।

ভিতর থেকে বিতাড়িত হয়েও পুরুষবর্গ কিন্তু একেবারে চলে যায়নি। বাড়ির বাইরে, কেউ সদর দরজার দাওয়ায়, কেউ রাস্তার উপরেই উবু হয়ে বসেছিল। অপেক্ষাকৃত উৎসাহী যারা তারা আর বসেনি, পায়চারি করছিল। আর মাঝে মাঝে ভিতরে ছেলে পাঠিয়ে বিনোদিনীর সংবাদ নিচ্ছিল। এর কিছুটা কারণ পল্লীগ্রামের আত্মীয়তা, কিছুটা কৌতূহল, আর কিছুটা বিনোদিনী নিজে। তার রূপের খ্যাতি অবশ্য বরাবরই আছে। কিন্তু নারীর প্রতি পুরুষের যে স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ আছে, তার জন্যে কেউ কখনও তার দিকে চেয়ে থাকতে সাহস করেনি। কিন্তু উৎসাহী ছোকরা যারা, প্রথমতঃ তাদের কারও কারও কানে এবং অবশেষে তাদের সকলেরই কানে বিনোদিনী-তারাপদ সংবাদ পৌছে গেছে। তারপর থেকে বিনোদিনীর সম্বন্ধে যে পরিমাণে তাদের মর্যাদাবোধ এবং সঙ্কোচ গিয়েছে কমে, সেই পরিমাণে লোভও গিয়েছে বেড়ে। অন্যান্য সকলকে নিয়ে তারাও বাইরে আসর জমিয়ে বসেছিল। প্রবীণের দল যখন বিনোদিনীর এই অসুস্থতার কারণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্নচিত্তে নানাপ্রকার অনুমান করছিল, ছোকরারা তখন তাদের অজ্ঞতা দেখে পরস্পরের গা টেপাটেপি করে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করছিল। এই সমস্তই যে বিনোদিনীর ছলনা, এবং ওই প্রকার স্ত্রীলোকদের স্বভাবসিদ্ধ ছলনা, সে বিষয়ে আর তাদের সংশয় ছিল না। তারা শুধু আরও নিবিড়ভাবে রসোপভোগ করবার জন্যে তারাপদর অভাব অনুভব করছিল। আর অপেক্ষা করছিল এর শেষ পরিণতি কিভাবে হয় তাই দেখবার জন্যে। তারাপদর সন্ধানে তারা অনেককে পাঠিয়েছে পর্যন্ত। কিন্তু কেউ তার সন্ধান পায়নি। তারাপদর সঙ্গে এমনিতেই তাদের মিলমিশ কম। কথায়-বার্তায় আচারে-ব্যবহারে এদের সঙ্গে তারাপদর একটা ব্যবধান ঘটেছে। সে একটা বাধা। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী বাধা, মাঠের এবং ঘরের কাজে এরা সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যার পর সকলে মিলে মহেশ্বরের বৈঠকখানায় ঢোল বাজিয়ে গান করে। এবং এদের গানে তারাপদর আগ্রহ না থাকায় সে সময়টা সে নিজের বাড়িতে বসে পড়া করে। নয়তো প্রবীণদের দলে বসে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করে। কিংবা পাশ্চাত্যের উন্নত কৃষিপদ্ধতির কতটা এ দেশে নিরাপদে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে

পারে, সে সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে। সেজন্যে সমবয়সীদের সঙ্গে দেখাশুনা কম।

এবারে প্রচুর বর্ষার ফলে মশার প্রকোপ বেড়েছে। যারা রাস্তায় পায়চারি করছে তাদের গায়ে তবু ততটা বসছে না। কিন্তু বুড়োরা যারা দাওয়ায় বসে আছে তারা এরই মধ্যে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু যেখানে বসবে সেখানেই তো এই অবস্থা। বিশেষ হারাণের এই বিপদে তাকে একলা ফেলেই বা যায় কি করে! সেই ভেবেই মশক-দংশন সহ্য করতে লাগল।

রসিক পাল তার কাকা গয়ানাথের হাতে হুঁকোটা দিয়ে বললে, অসুখটা বড় সামান্যি নয়, এই এক কথা বলে দিলাম।

গয়ানাথেরও সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। সে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে।

বৃন্দাবন যেন আকাশকে শুনিয়ে বললে, এ এক রকম মন্দ নয়। সূর্যি ডুবু-ডুবু সময়ে চেতলার বাকুড়িখানা দেখতে যাবার সময়ে নদীর ঘাটে ওকে দেখে গেলাম। ফিরে এসে শুনি অসুখ। আশ্চয্যি কাণ্ড বটে যা হোক!

বৃন্দাবনের কথার আর কেউ উত্তর দিলে না। সে এতক্ষণ ছিল না। বোধ হয় চেতলার মাঠেই ছিল। এতক্ষণে এসে পৌঁছল। আবার জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছে এখন?

রসিক ঘাড় নেড়ে জানালে, ভালো নয়।

বৃদ্ধ গয়ানাথ মাথা নীচু করে নিঃশব্দে বসে ছিল। এতক্ষণে যেন একটা কঠিন অঙ্ক গণনা শেষ করে মাথা তুললে। সর্বদর্শী বিজ্ঞের মতো বিরলকেশ মাথাটা ঠুক ঠুক করে নেড়ে বললে, এ নিশ্চয়ই সেই তেঁতুল গাছের কন্ধকাটার কাজ।

নটবর সাগ্রহে বললে, তা হতে পারে।

গয়ানাথ ওর সংশয় দেখে বিরক্ত হয়ে বললে, হতে পারে নয়, নিশ্চয়ই তাই। বলে ওই দেখে চুল পাকালাম, চার কুড়ি বয়েস হল।

ঠিক এমনই সময় একটি ছোকরা প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট একটি ছোকরার পায়ে এমন করে সুড়সুড়ি দিয়েছে যে, সে বেচারা আচম্বিতে সাপ বলে লাফিয়ে উঠে পড়বি তো পড় একেবারে গয়ানাথের ঘাড়ের উপর। বুড়োমানুষ সে ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। হুঁকোটা ছিটকে গিয়ে লাগল সম্মুখে দণ্ডায়মান বৃন্দাবনের নাকে। আর জলন্ত কলকেটা গিয়ে পড়ল ডান পাশের রসিকের উপর তুবড়ির মতো আগুনের ফুলকি উড়িয়ে। সাপের ভয়ে যতগুলি প্রবীণ লোক হুমড়ি খেয়ে এ ওর ঘাড়ের উপর পড়েছে, তারই মধ্যে গিয়ে পড়েছে রসিকও। সাপের হাত

থেকে প্রাণ বাঁচাতে সেও এমনই ব্যস্ত যে, আগুনের ছ্যাঁকাকে অন্ততঃ তখন আর ভ্রুক্ষেপ নেই।

জ্ঞান হল ছোকরাদের চাপা হাসির শব্দে। বুঝলে সমস্ত ব্যাপারটা রসিকতা। প্রবীণদের মধ্যে যারা রসিক, তারা নিজেদের বাল্যকালের কথা ভেবে হেসে উঠল। হাসতে পারলে না গয়ানাথ। বেচারা বুড়োমানুষ, ছোকরার ধাক্কায় তার চোট লেগেছে। তার উপর ভয় এত বেশী হয়েছিল যে, বুকের স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম। আর পারলে না রসিক। আগুনের ছ্যাঁকায় তার দেহের নানা স্থানে টোপ টোপ ফোস্কা পড়ে গিয়েছে। সে সব স্থান জ্বালা করছিল। বৃন্দাবন নাকে একবার হাত বুলিয়ে হুঁকো মাটি থেকে তুলে দাওয়ার নীচে ঠেস দিয়ে রাখলে।

ছোকরাদের প্রায় সকলেই গয়ানাথের সম্পর্কে নাতি হয়। রেগে থর থর কাঁপতে কাঁপতে বললে, শালারা এটা ঠাট্টা-মস্করার জায়গা পেয়েছে! বাড়ির ভেতর মানুষ মরে, আর ওদের এই সময় স্ফূর্তি বাড়ল! দূর করে দে শালাদের কান চেপে ধরে!

রসিক একটা হাত উঁচিয়ে বললে, কে রে! কে অমন করলে রে! হারামজাদারা আর মরবার জায়গা পেলে না?

যে ছোকরা গয়ানাথের ঘাড়ের উপর পড়েছিল সে ভয়ে ভয়ে বললে, এমন করে ওরা ভয় দেখালে!

—ভয় দেখালে! আর তুমি কচি খোকা, অমনি ভয় পেয়ে আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়লে। বৈজনাথের এই ছেলেটা একটা অকাল কুষ্মাণ্ড হয়েছে!

রাগে গয়ানাথের বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। আর রসিক পাল তো সামনে যাকে পায় তাকে এই মারে তো এই মারে।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে তারাপদ এল।

—কী হয়েছে! এখন আছে কেমন?

গয়ানাথ এবং রসিকের তখন উত্তর দেবার মতো অবস্থা নয়। তারা চুপ করে রইল। ছোকরারা তাকে দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু মুরুব্বিরা যে রকম তাদের উপর রেগে আছে, তাতে এখন আর কোনো কথা বলতে তারা সাহস করলে না।

নটবর উদাসভাবে বললে, ভালো নেই।

তারাপদ অস্থিরভাবে বললে, ব্যাপারটা কি?

বৃন্দাবন উদ্বিগ্নভাবে উত্তর দিলে, সন্ধ্যেবেলা নদীর ঘাট থেকে ফিরে এসে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে, আর জ্ঞান হয়নি।

তারাপদ সঙ্গে সঙ্গে বললে, ফিট! ও রকম অনেক রোগী আমি দেখেছি। একটু ব্লটিং পেপারের ধোঁয়া ··· ভেতরে কে কে আছে?

তারাপদ ব্যস্তভাবে ভিতরে যাচ্ছিল। গয়ানাথ গম্ভীরভাবে ডাকলে, ওহে ছোকরা!

তারাপদ ফিরে দাঁড়াল।

—শোন।

তারাপদ তার কাছে সরে এল।

গয়ানাথ অনুনাসিক সুরে বললে, ও সব ফিট মিট নয়! বেলাট ফেলাটের ধোঁয়ারও কাজ নয়! বুঝলে?

—তবে?

এত বড় সোজা ব্যাপারটা তারাপদ বুঝতে পারছে না দেখে গয়ানাথ হতাশভাবে প্রথমে রসিকের, পরে তার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নটবরের দিকে চাইলে।

নটবর ছোট্ট করে শুধু বললে, ভূত।

তারাপদ হো হো করে হেসে ফেললে। বললে, ভূত আবার কি।

গয়ানাথ আবার চটে উঠল। মুখ ভেংচে বললে, ভূত জানো না? চাষার ছেলে কলেজে পড়লে যা হয় তাই!

গয়ানাথের ক্রোধ দেখে তারাপদ যথেষ্ট কৌতুক বোধ করলে। আঙুল নেড়ে বললে, ঠাকুর্দা ওসব ভাঁওতা আর এ কালে চলছে না, তোমাদের কালে যা চলেছে তা চলেছে! একালে ভূতের ওষুধ বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ, বেরিয়েছে!

—দেখবে চল না। এক মিনিটে ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

গয়ানাথ মুখ ভেংচে বললে, খুব বাহাদুর! কে ও হারাণ না কি? ওঝা আনলে না কি? বেশ, বেশ!

হারাণ খিড়কির সোজা পথে ওঝা ডাকতে গিয়েছিল। সদর দিয়ে ফিরল। জিজ্ঞাসা করলে, এখন কেমন আছে?

এমন সময় তারাপদর বোন এসে খবর দিলে, বড়বৌ উঠে বসেছে!

সকলে সমস্বরে বললে, বসেছে!

—হ্যাঁ। ঝিম হয়ে খানিকক্ষণ পড়ে ছিল। যেমন রতনদিদি ডাকলে, অমনি উঠে এতগুলো লোক দেখে মাথায় ঘোমটা দিয়ে পিছন ফিরে বসল।

ব্যগ্রকণ্ঠে হারাণ জিজ্ঞাসা করলে, এখনও বসে আছে ?

জিভে একটা টাকান দিয়ে তারাপদর বোন বললে, বসে থাকবার জ্বালা! হাবল-মেনীকে খেতে দিতে গেল।

তারাপদ হেসে বললে, আমি বললাম···

গয়ানাথ তাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, তুমি থাম ছোকরা! যা বোঝ না সোঝ না···

গয়ানাথ কথাটা শেষ করলে না। কিন্তু উপস্থিত সকলেই যেন তার অসমাপ্ত কথাটা বুঝলে। বুঝে সকলেই খুব চিন্তিতভাবে মাথাগুলো নাড়তে লাগল।

সাত

উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মার পর এবারের ফসল দেখে মানুষের মনে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামে আর চাষীদের মন বসে না। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সবাই কেবল মাঠে মাঠে ঘুরছে। সুবিস্তীর্ণ মাঠের যেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, সর্বত্র গাঢ় সবুজ ধান লক লক করছে। আউশের শিষগুলির যেন আর নেচে নেচে আশ মিটছিল না। বহু মানুষের গানে ও কোলাহলে, জলনিকাশের একটানা গুরুগম্ভীর শব্দে, ধানগাছের মর্মরে সারা মাঠে যেন কিসের একটা সমারোহ চলেছে। ছেলে-ছোকরাদের তো কথাই নেই, গয়ানাথকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, এমন আউশ ধান তার জ্ঞানে সে দেখেনি। এক একটি ধানের গোছ এত মোটা হয়েছে যে মুঠোয় পাওয়া যায় না। আর মানুষ সমান উঁচু।

লোকে অবাক হয়ে গেল দেবতার অনুগ্রহ দেখে। গয়ানাথ বললে, ভগবান যখন দেন ছাপ্পর ফুঁড়েই দেন। যে সময়ে যেটি দরকার ঠিক সেই সময়ে সেটি যেন আপনা থেকেই হতে লাগল। বৃষ্টির সময় বৃষ্টি, রোদের সময় রোদ। এই সময়ে কিছুদিন খুব কড়া রোদের দরকার ছিল। তেমনি চমচমে রোদ আরম্ভ হল। দুদিন মাঠে ঘুরে চাষীদের দেহের বর্ণ দগ্ধশবের মতো হয়ে গেল। জমির জলে প্রথম প্রথম বুদ্‌বুদ্ কাটতে আরম্ভ হল। আলের পাশ দিয়ে যেতে গেলে কেমন এক রকম উগ্র গন্ধ ওঠে, আর তার সঙ্গে একটা উত্তাপ। দেখতে দেখতে জল গিয়ে জমির তলায় ঠেকল। একদিন এমনি রোদ করলে এ দুআঙুল জলও যাবে মরে। ঘিয়ে-রঙের মাটিতে চুলের মতো সরু সরু ফাট ফাটবে। তখন চাই ভালো এক পসলা বৃষ্টি। তা হলে যে আমন ধান হবে তা এ অঞ্চলে কেউ কখনও চোখেও দেখেনি। বিঘে ভুঁয়ে পঁচিশ মনের কম তো নয়ই। এক বছরে দুবছরের ধান।

এই আশায় এতদিনের নিরানন্দ গ্রামে যেন উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। অবশ্য কেবল বাক্যের এবং হাস্যের উৎসব। তার বেশী আর কারও সাধ্য নেই। মহেশ্বরের বৈঠকখানায় আড্ডা যেন জমজমাট হয়ে উঠল। শীর্ণ আড্ডার কলেবর দিন দিন স্ফীত হতে লাগল। এ-পাড়া ও-পাড়া হতেও ছোকরারা এসে জমতে লাগল।

মহেশ্বরের বৈঠকখানা দুকুঠরি চালা ঘর। পিছনটা গোয়াল, আর সামনেটা

বৈঠকখানা। একটিও জানালা না থাকায় এই গরমে ঘরের ভিতরে বসা অসম্ভব। বাইরের দাওয়ায় বসে। এতদিন অবশ্য সেই সঙ্কীর্ণ দাওয়াতেই কুলোত। গায়ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর এখন সংকুলান হয় না। যারা আসল গায়ক তারা উপরে বসে। দোহাররা নীচে। এতদিন শুধু একখানা ঢোলই ছিল বাদ্যের উপকরণ। সম্প্রতি ও-পাড়ার ছোকরারা তার সঙ্গে একটা গাবগুবাগুব যোগ করেছে। এতেই বাড়ি ভেঙে পড়বার উপক্রম। গোয়ালের গরুগুলি আগে প্রায়ই দড়ি ছিঁড়ত। এখন আর ছেঁড়ে না, সঙ্গীত শ্রবণে অনেক পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবু অন্যমনস্ক থাকলে প্রথম গানের ঝোঁকে আচমকা চমকে চীৎকার করে ওঠে।

ওদের গানের পুঁজি বেশী নয়। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। এক একখানা গান এক এক ঘণ্টা চলে—যতক্ষণ না হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক ছিলিম তামাক খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার পরবর্তী গান আরম্ভ করে। একখানা গান ওদের সবচেয়ে প্রিয়। রোজ সেইটে দিয়ে মজলিস আরম্ভ হয়। জনৈক জামাতার সম্বন্ধে গান। এত জনপ্রিয় হওয়ার একটা কারণ এই যে, গ্রামেরই জামাই, সকলেই তাকে চেনে। গ্রামের ছোকরাদের চিরপ্রথামত একদিন না খাওয়ানোয় তার উপর চটে গত চৈত্রমাসে বোলানের সময় তার নামে এই গানখানা বেঁধে গাওয়া হয়েছিল। এখনও হয়। ফলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে।

গানখানা এইরূপ :

দেখি নাই, দেখি নাই,
এমন তো জামাই কোথাও দেখি নাই।
নরহরি নাম গো,
কদমতলা গেরাম গো,
মাথাতে তার একটি গাছি চুল নাই।
দেখি নাই, দেখি নাই।
আরও তো ভাই জামাই আছে,
কেউ লাগে কি এঁয়ার কাছে ?
যেমন কণ্ঠস্বর গো,
পেত্নী বলে, সব গো,
ছেলের লাগে ডর গো,
কেন তুই হলি এমন ঢেঁকি ভাই ?
এমন তো জামাই কোথাও দেখি নাই।

আরও খানিকটা আছে। এর রচয়িতা মহেশ্বর নিজে। সে নিম্ন প্রাথমিক পাস। গানের শেষে ভণিতা আছে :

যতগুলো বোলান বললাম,
আরও বলতে পারি।
ওস্তাদের নাম মহেশ্বর,
কলমপুরে বাড়ি।।

সেদিনও সন্ধ্যার কিছু পরে ওদের নৃত্য-গীত-বাদ্য পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। একে ভাদ্রের পচা গুমোট। তার উপরে গুমোট যেন আরও বেড়েছে। আর তেমনি মশা। একটু পরে পশ্চিমের মেঘে গুরু গুরু ডাক আরম্ভ হল। কিন্তু সে ডাক ওদের কানে পৌঁছল কি না কে জানে! হয়তো ঢোলের শব্দের মধ্যে ডুবে গেল। আর একটু পরে আরম্ভ হল ঝমাঝম বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি! তিন ঘণ্টা সমানে নামল, তবু বিরাম নেই।

একেই তো এবার পুকুর-পুষ্করিণী সব কানায় কানায় টলমল করছিল, এই বৃষ্টির চাপে সমস্ত ছাপিয়ে হুম হুম শব্দে নালা দিয়ে জল নামতে লাগল। নৃত্য গীত বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ছুটতে ছুটতে বাড়ি গিয়ে একখানা করে মাথালি আর একটা করে আলো নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ল।

পাউষের মাছ। এবারে বৃষ্টি হওয়ার জন্যে সকলেই নিজের নিজের পুকুরে মাছের পোনা ফেলেছিল। সমস্ত মাছ বেরিয়ে পড়ল নালায়, ডহরে, রাস্তায়। স্রোতের বিরুদ্ধে উজান বয়ে চলতে লাগল অজস্র রুই-কাতলা মৃগেলের পোনা, ছোট বড় কই-মাগুর-ন্যাটা, পুঁটি-বাইন-খরয়া-ট্যাংরা। দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে। নালায় খালে, যেখানে জল বেশী সেখানে, লোকে জাল পেতে বসে রইল। যেখানে ছিপছিপে জল সেখানে তারও হাঙ্গাম নেই। শুধু একটা আলো নিয়ে বসে থাকলেই হল। মাছগুলো শির শির করে চলছে। চেপে ধরে কেউ খাড়ুই, কেউ বালতি, কেউ বা একটা ঘটির মধ্যে বিনায়াসে পুরতে লাগল। আর যাদের নিজেদের পুকুর আছে তারা সদলবলে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে চলল পুকুরের মোহনা বাঁধতে। কিন্তু এই বর্ষণের মুখে মোহনা বাঁধা বড় সহজ কথা নয়। যাদের জোটপাট আছে, তারা কোনো রকমে খানিকটা বাঁধ দিয়ে শরকাঠির বাড় পুঁতে দিয়ে সারারাত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। নইলে কেউ বদমাইশি করে বাড় তুলে দিতে পারে। বাড়ের এই সুবিধা যে, তার ফাঁক দিয়ে জল বেশ বেরিয়ে যাবে, কিন্তু মাছ পালাতে পারবে না।

অল্পক্ষণেই লোকের মাছ ধরার আশ মিটে গেল। প্রথমতঃ প্রত্যেকে এত মাছ পেলে যে, তিনচার দিন আর কাকেও মাছ কিনতে হবে না। লোভের বশে তার পরেও যদি কেউ ধরত, এই বৃষ্টিতে সে লোভ সকলকেই সংবরণ করতে হল। তারা সবাই উল্লাসে চীৎকার করতে করতে গৃহে ফিরে গেল। সেই ঘনান্ধকার রাত্রে মসীলিপ্ত মাঠের স্থানে স্থানে জ্বলতে লাগল দুটি একটি করে আলো—বৃষ্টিতে ঝাপসা। ফিরতে পারল না কেবল পুকুরওয়ালার দল। সমস্ত রাত সেই ঘনবর্ষণ আর বজ্রপাতের মধ্যে তারা পাহারা দিতে লাগল পুকুরের মাছগুলি। জলের চাপে এখানকার মোহনা আটকায় তো ওখানটা ভাঙে, ওখানটা আটকায় তো এখানটা ভাঙে।

এ যে কি দুরন্ত প্রয়াস বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। সূচের মতো তীক্ষ্ণ বারিধারা সর্বাঙ্গে বিঁধছে। এক টুকরো মাথালি আর কতটা রক্ষা করবে? ঝড়ের ঝাপটায় তারা একবার গিয়ে পড়ছে পুকুরের জলে, একবার জমিতে। থেকে থেকে বাজ পড়ছে কড় কড় শব্দে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে চোখ ধাঁধিয়ে। হিলহিলে হাওয়ায় হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর আছে সাপ। বৃষ্টিতে ক্রমে ক্রমে চারিদিক জলমগ্ন হচ্ছে, আর গুচ্ছে গুচ্ছে সাপ এসে উঁচু পাড়গুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে। আলো আছে তাই রক্ষা। সব চেয়ে মজা হয়েছে ঢোঁড়া সাপগুলির। তারা সব মোহনার আনাচে কানাচে, মাছ পালাবার রাস্তায় ওত পেতে বসে আছে। মাছ যাচ্ছে, আর টুপ টুপ করে ধরে পেটের মধ্যে চালিয়ে দিচ্ছে। এই বৃষ্টিতে তাদেরই ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে ভালো। মাঝে মাঝে নগদবিদায় স্বরূপ দু-চার ঘা লাঠিও যে না মিলছে তা নয়। কত সাপের কোমর ভেঙে যাচ্ছে। কেউ বা একেবারেই যাচ্ছে মরে। তবু আবার আসছে ভাঙা কোমর নিয়ে। কি করবে? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! মানুষই পেটের তাগিদে লজ্জা-সম্ভ্রম-ভয় বিসর্জন দেয়। ওরা তো তুচ্ছ সরীসৃপ।

রাত্রি বারোটার সময় বৃষ্টি একটু ধরল। কিন্তু একেবারে থামল না, ফিস ফিস বর্ষণ চলতে লাগল। হারাণের একটি মাত্র পুকুর—বাড়ির পিছনের ডোবাটি। একটি মাত্র পুকুর বটে, কিন্তু ষোলো আনা একা তারই। অংশীদার নেই। এতদিন ধরে এই একাধিপত্যের সুযোগই সে ভোগ করে আসছিল। আজ এই প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে এই সর্বপ্রথম তার মনে হল একজন অংশীদার থাকলেই ভালো হত—একজন সাহায্যকারী। কিংবা যদি হাবল ছোঁড়াটা সাবালক হত। ডোবার দুদিকে দুটো মোহনা আটকানো একা তার পক্ষে বড় কষ্টকর হচ্ছে।

অবশ্য বিনোদিনী আছে। মাথায় একটা তালপাতার টোকা। আলুলায়িত কুন্তলের মতো নিতম্ব পর্যন্ত ঝুলছে। পরনের কাপড় গায়ের সঙ্গে গিয়েছে ভাঁজে ভাঁজে লেপটে। একে অন্ধকার সুনির্জন রাত্রি, তাতে সমস্ত মন মৎস্য-রক্ষায় নিযুক্ত। সর্বাঙ্গে ভালো করে কাপড়খানি জড়াবার আবশ্যকও বোধ করেনি, সে খেয়ালও হয়নি। এ দুর্যোগে সে-ই হারাণের একমাত্র দোসর। হাবল মেনী ঘরের মধ্যে একটা নিরাপদ কোণে চট মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

অবশ্য দোসর হওয়ার শক্তি বিনোদিনীর নেই। তবু হারাণের সঙ্গে তো একজন আছে। যেখানে সে যাচ্ছে তার পেছনে আলো নিয়ে বিনোদিনী ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে তো। কখনও কোদালটা এনে দিচ্ছে, কখনও ঝুড়িটা। কথা বলার কারও সময় নেই। স্থান এবং কাল কথা বলার অনুকূলও নয়। মোহনার ধারে হারাণ ঝপাঝপ মাটি কোপাচ্ছে। তার বৃষ্টি-ধারাসিক্ত কষ্টিপাথরের মতো দেহ হারিকেনের আলোয় চিকমিক করছে। পেশীগুলো থাঁজে থাঁজে ফুলে ফুলে উঠছে। সেই তরল অন্ধকারে এই ঘনকৃষ্ণ কঠিন মূর্তি ঘুরছিল, ফিরছিল, উঠছিল, বসছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন মানুষের রক্তমাংসের দেহ নয়, যেন কোন নিপুণ ভাস্করের হাতে কোঁদা কষ্টিপাথরের মূর্তি। হারাণের দেহে খুঁত আছে অনেক। তার চোখ জবাফুলের মতো লাল, গোল গোল। ঠোঁট পুরু, হাঁ-মুখ বড়। কিন্তু এই অন্ধকারে সে সব বিনোদিনীর চোখে পড়ছে না। পড়ছে কেবল তার পেশীবহুল, বলিষ্ঠ দেহের কাঠামো। বার্ধক্যের বহু রেখাঙ্কিত মুখ নয়, মাথার কাঁচা-পাকা চুল নয়, মুখের খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি নয়, কিছু নয়। বিনোদিনীর মনে হল, কে বলে তার স্বামীকে কালো। এমন বলিষ্ঠ দেহ, এমন নিখুঁত গড়ন কার আছে?

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মোহনা বাঁধিয়ে হারাণ আবার উত্তর-পশ্চিম কোণের মোহনায় ফিরে এল। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছে। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। তার পিছু পিছু বিনোদিনী। এমনি করে হারাণের পিছু পিছু ঘুরতে তার বড় ভালো লাগছিল। দিনের বেলা হলে পারত না। চাঁদিনী রাত্রি হলেও না। দুর্যোগময়ী রাত্রি অভাবিতরূপে বয়ে এনেছে চরম ক্ষতির সঙ্গে পরম সঞ্চয়। এই ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্যোগকে তার রমণীয় বোধ হল।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তার ফিস ফিস শব্দের সঙ্গে পাতার মর্মরধ্বনি মিশে একটি চমৎকার ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে। হাওয়ার দোলায় ডোবার জলে ঢেউগুলো এসে ধারে আছড়ে পড়ছে ছলাৎ ছল। হারাণ হাত-পা ধুয়ে এতক্ষণ পরে পিছন ফিরে বিনোদিনীর দিকে চাইবার অবকাশ পেলে। হারিকেনের আলো

এসে পড়েছে ওর তৃতীয়ার চন্দ্রলেখার মতো ক্ষীণ ললাটপটে, ওর সিক্ত বসনাবৃত দেহের স্থানে স্থানে। বিন্দু বিন্দু জলকণা ললাটে এঁকেছে অলকাতিলকা। ওর রসভারসমৃদ্ধ পরিপুষ্ট তনুদেহ এই আলো-অন্ধকারে আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে। তার কিছু দেখা যায়, কিছু বোঝা যায়।

হারাণ ওর রহস্যময় মুখের দিকে চাইলে। সে ছিল নীচুতে দাঁড়িয়ে, জলের ধারে। আর বিনোদিনী পাড়ের উপর, উঁচু জায়গায়। তাই দুজনে মাথায় হয়েছে সমান-সমান, ঠিক সেই শুভদৃষ্টির সময় উত্তোলিত পিঁড়িতে বসে যেমন হয়েছিল। জীবনে এই দ্বিতীয়বার দুজনে সমান-সমান হল। হারাণকে এই দ্বিতীয়বার ওর দিকে মাথা তুলে চাইতে হল। সে দৃষ্টিতে বিনোদিনীর দীর্ঘ আঁখিপল্লব লজ্জাবতী লতার মতো বুজে এল। হারাণের মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন যেন কুয়াশার সৃষ্টি হল। সে ধীরে ধীরে উঠে এসে ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। কি যেন সে বলতে চাইলে, পারলে না। আঙুলের প্রান্ত দিয়ে ওর অনাবৃত বাহুতে মৃদু মৃদু হাত বুলোলে! তারপর ওর মাথা থেকে তালপাতার টোকাটি খুলে নিলে।

বিনোদিনী ওর মাথালির নীচে সরে এল। মৃদু হেসে বললে, চুল ভিজে যাচ্ছে যে!

হারাণও হাসলে। কেমন একটা অসুস্থ হাসি। আবার ওর মাথায় টোকাটি পরিয়ে দিলে।

বললে, ঘরে যা। হাবল মেনী একলা আছে।

—তুমি?

একটু ইতস্ততঃ করে হারাণ বললে, চল্, আমিও যাই।

হারাণ কোদালটা কাঁধে তুলে নিলে। এক হাতে ঝুড়ি, আর এক হাতে লাঠি। আলো নিয়ে আগে আগে চলল বিনোদিনী। পিছনে হারাণ। কিন্তু তার আগে আগে আসতে বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা কি যেন একটা ভয়ে, কেমন একটা উৎকণ্ঠিত আনন্দে দুরু দুরু করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল ওর জলন্ত বুভুক্ষু দৃষ্টি তার সিক্তবসন দেহের সর্বত্র বিচরণ করছে।

আবার বৃষ্টি আরম্ভ হল ভোরের দিকে। রাত্রের মতো তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। বেলা বারোটার আগে আর থামল না।

পুকুর-পুষ্করিণীতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল তার কিছুই আর রইল না। সেই জল মোহনা ভেঙে দুমদুম শব্দে গিয়ে পড়ল ধানের জমিতে। মাঠ জলে একাকার

হয়ে গেল। আউশ ধানের কচি কচি শিষগুলো সবে উঠেছে। ঝড়ের ঝাপটায় সেগুলো জমিতে শুয়ে পড়ল। যে রকম ধান গত বিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখা যায়নি, একদিনের জলে তার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হল। যার ফুল ধরেছে তার ফুলগুলো গেল নিঃশেষে ঝরে। যার শিষ ধরেছে, সলিলসমাধির পরে তাতে আর শস্য হবার কোনো সম্ভাবনাই রইল না।

কেউ থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে ধান কিনে, কেউ বা আগামী মাঘ মাসে দেড়গুণ হারে ফিরিয়ে দেবার কড়ারে ধান বাড়ি নিয়ে কি কষ্টে যে এই ক'টা মাস চালিয়েছে তার বর্ণনা চলে না। এত দুঃখেও এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, আশ্বিনের মাঝামাঝি আউশ উঠলে আর ভাবনা থাকবে না। তাতে কোনো রকমে দুটো মাস চালাতে পারলে অগ্রহায়ণের আট নয় তারিখে লখু ধান উঠবে। নিদারুণ অন্নচিন্তাটা কমবে। কিন্তু ভগবান বিরূপ। পৌনে ষোলো আনা জমির আউশের সমস্ত আশাই নিঃশেষ হয়ে গেল।

কিন্তু মানুষে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাববারও সময় পেলে না। বর্ষণের জল তো আছেই, তার উপর মোড়ল-পুকুরের মোহনা ছাপিয়ে সেই জল হু হু করে ঢুকল গ্রামের মধ্যে। এ ছাড়া জল বার হবার আর পথও নেই। মোড়ল-পুকুরের মোহনা থেকে একটা গলিপথে বড় রাস্তা। তার পরে বাঁ দিকে একটা নালা গিয়েছে, সেই নালা গ্রামের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে এঁকেবেঁকে অনেক দূর ঘুরে ডহরে পড়েছে। এইটেই গ্রামের জল নিকাশের রাস্তা। কিন্তু নালার দুপাশের অধিবাসীদের দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় একটু একটু করে বর্তমানে সেটা এমন সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে প্রচুর জল নিকাশের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং মোড়ল-পুকুরের জল কিছু চলল নালা বেয়ে, আর কিছু প্রবল বেগে গ্রামের মাঝামাঝি বড় রাস্তা দিয়ে। বেলা নটার মধ্যে সদর রাস্তায় এক কোমর জল দাঁড়াল। সেখান থেকে প্রবেশ করল দুধারের প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে। জল ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রথমে সামান্য একটু, তারপরে পায়ের গোছ পর্যন্ত, অবশেষে এক হাঁটু। জল সমস্ত উঠোনটিকে গ্রাস করে ফেললে। দাওয়া ডুবু ডুবু। আরও যদি বাড়ে, লোকের ঘরের ভিতরে ঢুকবে।

লোকে গালে হাত দিয়ে যথাযোগ্য সমারোহে যে আউশের জন্যে শোক করবে, তারও অবসর নেই। খাওয়ার ভাগ্যে যা হবার তা হবে, এদিকে বাড়ি পড়ো পড়ো। কয়েকখানা প্রাচীর ইতিমধ্যেই পড়ে গেল। আরও কতকগুলো পড়বার ভয় দেখাতে লাগল। অতখানি জলের মধ্যে মাটির প্রাচীর কতক্ষণ টিকবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। বৃষ্টি থেমে গেল। রাস্তার জল কমার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বরং বেড়েই চলল। জানা গেল, দক্ষিণের মাঠ থেকে দুমদুম শব্দে জল নামছে। এই জল ডহরের নালাকে এমন ব্যস্ত রেখেছে যে, এ গ্রামের জল বার হবার পথ তো পাচ্ছেই না, বরং উল্টে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। জলবৃদ্ধির কারণ তাই।

ফল এই হল যে, সমস্ত দিনরাত্রি গৃহপতনের দুমদাম শব্দ থেকে থেকে গ্রামকে সচকিত করতে লাগল। আর মানুষের দুঃখ-দুর্দশার তো কথাই নেই।

রসিক পালের স্ত্রীর রান্না-বাড়া প্রায় শেষ হয়ে এল এমন সময় তার রান্নাঘরখানি সশব্দে পড়ল, কতক রাস্তার দিকে, কতক বাড়ির ভিতরে। রসিক পালের স্ত্রী ছুটে বেরিয়ে এসে প্রাণ রক্ষা করলে। নিজে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাওয়ায় প্রথমটা সে খুব খুশী হয়ে উঠল। কিন্তু তার পরেই চীৎকারে এবং কান্নায় পাড়া মাথায় তুললে। সমস্ত পরিবারের মুখের আহার নষ্ট হয়েছে। একটু পরে ছেলেরা যখন ক্ষুধায় কাঁদতে থাকবে, কী তাদের মুখে দেবে? এই গৃহেরই অপরার্ধ ভাঁড়ার ঘর। চাল ডাল নুন তেল মুড়ি গুড় সবই সেখানে থাকে। সবই এখন মাটির নীচে চাপা পড়েছে। ঘরে একটি দানা নেই যা দিয়ে অন্ততঃ ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে।

হারাণের গোয়াল ঘরখানি গেল পড়ে। দৈবানুগ্রহে গরু-বাছুরগুলি রক্ষা পেল বটে, কিন্তু অতঃপর কোথায় যে তাদের আশ্রয় দেবে সে এক চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। তার রান্নাঘরখানির অবস্থাও ভালো নয়। চালের ফুটো দিয়ে বহু স্থানে দেওয়াল বেয়ে জল পড়ছে। যদি আর বৃষ্টি না হয় তা হলে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু বৃষ্টি যে আর হবে না মেঘের অবস্থা দেখে কে সে কথা জোর করে বলতে পারে!

হারাণ এই সব কথা ভাববে, না মাঠের কথা ভাববে! যে রকম ভাসান মাঠে হয়ে গেল তাতে কিছু জল কেটে বার করে দিতে হবে, তারপরে আলগুলো বাঁধতে হবে। ভাসানের জলে একটি আলও আস্ত থাকবে না। আউশের যা হল সে তো ভালোই হল, এখন আমনগুলো বাঁচাতে তো হবে। হারাণ সমস্ত দিন একবার ঘর আর একবার মাঠ করতে লাগল। বিনোদিনীর মাথার দিব্য সত্ত্বেও একদানা মুড়ি দাঁতে কাটবার অবকাশ পেলে না। যখন চারটে, তখন একেবারে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে যেন একেবারে এলিয়ে পড়ল। সমস্ত দিনের ছোটাছুটি, গুরু পরিশ্রম আর উদ্বেগে তার যেন আর দাঁড়াবার শক্তি রইল না।

বিনোদিনী ভাত বেড়ে দিলে। হারাণ যেন রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে সেগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগল। নিঃশব্দে। ওর মাথা তখনও ভিজে ছিল। টপ টপ করে জল পড়ছিল। বিনোদিনী নিজের আঁচল দিয়ে ওর ভিজে মাথা মুছিয়ে দিলে। সে স্নেহের স্পর্শে ওর তপ্ত মন অনেকখানি শীতল হল।

বললে, আউশের কাজ তো শেষ হয়ে গেল।

বিনোদিনীও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, দেবতা যে দিয়ে এমন নিরাশ করবে কেউ ভাবেনি।

হারাণ মাথা নেড়ে বললে, আমি জানতাম। এমন আউশ আমার জ্ঞানে কখনও দেখিনি। এ কি আর ঘরে আসে!

বেঁধে মারে সয় ভালো। বিনোদিনী চুপ করে রইল।

হারাণ বললে, আবার দুটো ধানের জন্যে কার যে পায়ে তেল দোব তাই ভাবছি। ভেবেছিলাম···

বিনোদিনী বললে, এই তিনটে মাস তো। তারপরে···

হারাণ এত দুঃখেও হেসে ফেললে। বললে, তুই তাই মনে করেছিস বুঝি? ডাকপুরুষে বলে, 'আউশ দেখে হৈওৎ বোঝ'। যা আউশের হল, আমনেরও তাই হবে দেখিস।

ডাকপুরুষের কথায় বিনোদিনী মুখঝামটা দিলে। বললে, ডাকপুরুষ অমন কত বলে! এবারও তো বৃষ্টি হবে না বলেছিলে। কি হল?

—যা হোক না কেন। বৃষ্টি হলে কি হল তা দেখ!—হারাণ বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লে,—বাবা! বলে ডাকপুরুষের বচন! ও কি মিথ্যে হবার যো আছে।

বিনোদিনী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, আর দুটি ভাত দিই?

—মাছের টক আর আছে?

—আছে বই কি!

—তবে দে আর দুটিখানি। খুব মাছটা লোকে খেয়ে নিলে যা হোক।

বিনোদিনী হারাণের পাতে আর একমুঠো ভাত আর মাছের টক দিলে। হারাণ টকে একটা টাকান দিয়ে বললে, টকটা বেশ রেঁধেছিস। খাসা হয়েছে।

বিনোদিনী বিনয়ে মুখ নীচু করলে।

হারাণ রসিকতা করে বললে, আর যা হোক, তুই রাঁধিস ভালো কিন্তু।

বিনোদিনী হেসে বললে, থাক।

উত্তরে হারাণ কি একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় তার রাখাল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সংবাদ দিলে, তার কাপাসতলার কাচির আল বেঁধে দিচ্ছে।

—কে?

—রসিক পাল।

হারাণ দুগ্রাসে পাতের ভাত শেষ করে লাফিয়ে নীচে নামল।

তার এই কাপাসতলার কাচি জমিতে আউশ আছে। জমির জল মরে রসিক পালের জমির উপর দিয়ে। সেখানাতেও সে আউশ দিয়েছে। দুপুর বেলায় হারাণ তার জমির জল কেটে দিয়ে এসেছিল। অবশ্য যে বৃষ্টি হয়েছে তাতে আউশের আশা বিশেষ নেই। কিন্তু মানুষের মন থেকে আশা তো অত সহজে যায় না। যদি কিছু বাঁচে এই ভরসায় সে জল কেটে দিয়ে এসেছিল। রসিক ভেবেছে, হারাণের জমির জলও যদি তার জমির উপর দিয়ে যায় তাহলে তার জমির জল মরতে বহু দেরি হবে। সেই কথা ভেবে সে হারাণের জমির জল বন্ধ করে দিচ্ছে। এতে হারাণের জমির যথেষ্ট ক্ষতি হবে। ধানের যা হবার তা তো হয়েছেই, জল যদি বন্ধ থাকে তা হলে খড়গুলো পর্যন্ত পচে যাবে। গরুতে মুখে দেবে না।

সমস্ত দিন না খেয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে এবং সংসারের নানা দুশ্চিন্তায় তার মেজাজ এমনিতেই খারাপ হয়ে ছিল। রাখালটার কথা শুনে তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল হারাণ রসিকের উদ্দেশে একটা অকথ্য গালাগালি দিয়ে একখানা পাকা বাঁশের হাত-লাঠি আর একটা কোদাল নিয়ে বেরুল।

ওকে লাঠি নিতে দেখলেই বিনোদিনীর আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। হাতে লাঠি থাকলে ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। এমনিতে হারাণ সদাশিব লোক। মন ভালো থাকলে তাকে কেউ দুঘা মেরে গেলেও কথাটি কইবে না। কিন্তু রাগলে আর ওর জ্ঞান থাকে না। তার পিতৃপুরুষের ডাকাতি রক্ত একেবারে মাথায় চড়ে। ওর পক্ষে একটা মানুষকে খুন করাও তখন বিচিত্র নয়।

এ কথা বিনোদিনী জানে। হারাণের মুখ দেখে ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠল। এঁটো হাত ধোবারও আর অবসর হল না। বিনোদিনী সেই অবস্থাতেই ছুটে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, ধানের যা হবার তা হোক। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর এর ওপর অনর্থ বাধিও না।

দাঁতে দাঁতে চেপে হারাণ শুধু বললে, মেয়েমানুষ কোথাকার!

তারপর তাকে একটা ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে বিদ্যুতের মতো বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হারাণ যখন ফিরে এল তখন তার মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে ওর দেহের সমস্ত রক্ত কে যেন চুষে শেষ করেছে। এমনিভাবে এসে সে দাওয়ায় নিঃঝুম হয়ে বসল।

বিনোদিনী অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর প্রতীক্ষায় বসে ছিল। কাপাসতলার মাঠ এখানে নয়, অনেক দূর। কি যে সেখানে হচ্ছে এই ভেবে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। হারাণ চলে যাওয়ার পরই সে ছুটে গিয়ে নটবর আর বৃন্দাবনকে খবর দেয়। নটবর বাড়িতে ছিল না। বৃন্দাবনও মাত্র একটু আগে মাঠ থেকে ফিরেছে। কিন্তু বিনোদিনীর কান্নাকাটিতে তার স্ত্রী তাকে বসতে দিলে না। যাতে গোলমাল না হয় সেজন্যে তখনই পাঠিয়ে দিলে। এ সময়টা বহু লোক মাঠে থাকে। সুতরাং তারা যে খুনখারাপি হতে দেবে না এ নিশ্চয়। কিন্তু হারাণ না ফিরে আসা পর্যন্ত সে সুস্থির হতে পারছিল না। অবশেষে বেলা যখন গড়িয়ে এল তখন আর অপেক্ষা করতে পারলে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তেঁতুলতলার নীচে দিয়ে আসায় এক কাণ্ড ঘটেছে। তার নিজের এই বিশ্বাস। আর সন্ধ্যা করা হবে না। সে উঠে নদীর ঘাটে গেল গা ধুতে। যখন ফিরে এল, দেখে হারাণ একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছে। কতক্ষণ থেকে কে জানে!

ওকে তদবস্থায় দেখে বিনোদিনীর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। রান্নাঘরের দাওয়ায় জলের ঘড়াটা নামিয়ে রেখে ভিজে কাপড়েই ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, অমন করে বসলে কেন? ওগো, কি সর্বনাশ করে এলে?

হারাণ নিঃশব্দে একবার ঘোলাটে চোখ মেলে তার দিকে চাইলে। যেন চিনতেই পারলে না।

ওর চেহারা দেখে বিনোদিনী ছাচতলাতেই বসে পড়ল। সে চীৎকার করে কাঁদবে, কি, কি করবে বুঝতে পারলে না। কিন্তু চীৎকার করে কাঁদবার শক্তিও তার নেই। গলার মধ্যে কে যেন পাথর চাপা দিয়েছে। স্বর বেরুচ্ছে না।

হারাণের যেন ধীরে ধীরে সংবিৎ ফিরে এল। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে বাইরে চলে গেল। সর্বনাশ সে কারও করে আসেনি। জল কাটা নিয়ে রসিক পালের সঙ্গে দাঙ্গাও হয়নি। বৃন্দাবন এবং মাঠের আরও পাচজন এসে ব্যাপারটার সামান্য আয়াসেই যবনিকা টেনে দেয়। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে তার নিজের। বচসার মুখে বিনোদিনীর সম্বন্ধে রসিক পাল যে কথা বলেছে তাতে তার পায়ের

তলার মাটি যেন সরে গেছে। এমন সর্বনাশ বুঝি মানুষের হয় না। এক মুহূর্তে দুর্মুখের মুখের একটি অসতর্ক বাক্যে তার সমস্ত অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে গেল। জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান, গরু-বাছুর, ঘর-দুয়ার, লাভের বাসনা, ক্ষতির আশঙ্কা— এক কথায় যাকে সংসার বলে—চক্ষের পলকপাতে সমস্ত একটা বিরাট পরিহাসে পর্যবসিত হয়ে গেল। মায়া নয়, মিথ্যা নয়—তা হলেও তো বাঁচা যেত—এ সমস্তই বিধাতার অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং সম্পূর্ণ অযাচিত রসিকতা। হারাণের মনে হল, এই শস্যভারসমৃদ্ধ উন্মুক্ত অবারিত মাঠে অনন্ত আকাশের নীচে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে সেও একটা খুব বৃহৎ রকমের উচ্চহাস্য করে ওঠে এই বিপুল সৃষ্টির ব্যর্থতায়, মানবজীবনের নিরর্থকতায়, এই ইহসংসারের বিরাট শূন্যতায়।

কিন্তু সে পরে। তার আগে বিনোদিনী সংক্রান্ত কুৎসিত অপবাদ শোনামাত্র সে চমকে মুখ বিকৃত করলে। যেন অকস্মাৎ তার পায়ে সাপে কামড়েছে। চকিতে পায়ের বিষ উঠল মাথায়। এবং চক্ষের পলকে যে লাঠি সে তুললে রসিকের মাথা লক্ষ্য করে, বৃন্দাবন অসামান্য তৎপরতায় পিছন থেকে সে লাঠি ধরে না ফেললে রসিকের মাথা সেই মুহূর্তেই দুফাঁক হয়ে যেত। বিনোদিনী সম্বন্ধে এত বড় নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদ! কিন্তু সমবেত সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হারাণ দেখলে, সবাই যেন একটুখানি বাঁকা হাসি মুখ ফিরে গোপন করলে।

হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়ে হারাণ টলতে টলতে ছুটল, কোথায় তা সেও জানে না। দুপাশের তরঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র, অস্তমান রক্তসূর্য, সমস্ত তার দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল। কোথা দিয়ে কি করে যে বাড়ি ফিরে এল তা আর তার নিজেরও স্মরণ নেই। বিনোদিনীকে দেখে তার সর্বপ্রথম খেয়াল হল সে বাড়ি ফিরে এসেছে। সে ধীরে ধীরে উঠে বাইরে চলে গেল।

বিকেলের দিকে মেঘ কেটে রোদ উঠতেই বিনোদিনী গরুগুলিকে বাইরে বেঁধে দিয়ে এসেছিল। হারাণকে দেখেই সেগুলো চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার নিজের গরু। তার চোখের সামনে সবগুলি জন্মেছে, তার সেবায় যত্নে বড় হয়েছে। সে এসে দাঁড়ালে বুধী তার সদ্যোদ্গত শৃঙ্গ দিয়ে পিঠ চুলকে দেয়, তার হাতের স্পর্শের জন্যে মুঙলী দেয় গলা বাড়িয়ে। এসব তার নিজের সম্পত্তি। তার একান্ত আপনার। তার পার্থিব সত্তার অংশ।

হঠাৎ দোলা লেগে সম্মুখের তালগাছের শুকনো পাতা উঠল মর মর করে। উচ্চকিত হয়ে হারাণ চেয়ে দেখলে সেখানে এক টুকরো সোনালি রোদ তখনও চিকমিক করছে।

হারাণের হঠাৎ মনে হল, সব মায়া। অনতিকাল পূর্বে কাপাসতলার মাঠে যে কাণ্ড ঘটেছে তা মিথ্যা, মায়া। তার মনের ভুল। আসলে তা ঘটেনি। সমস্ত স্বপ্ন—অত্যন্ত কঠোর, মর্মঘাতী দুঃস্বপ্ন।

ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে কফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়ল। হায়! সত্যই যদি স্বপ্ন হত, মিথ্যা হত, মায়া হত! এই অত্যন্ত অশুচি এবং অশুভ মুহূর্তটি যদি তার জীবনের তরঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বুদবুদের মতো মহাশূন্যতায় হারিয়ে যেত! বাড়ির দিকে পিছন ফিরে হারাণ স্ত্রীলোকের মতো ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলো।

বিনোদিনী সম্বন্ধে তার কেমন একটা দুর্বলতা আছে। ওর কাছে কিছুতে সে যথেষ্ট নিষ্ঠুর হতে পারে না। ওর চোখের জলে তার কঠোরতা যেন গলে গলে ঝরে ঝরে পড়ে। মেরুদণ্ডের জোর যায় কমে। তার লোহার মত শক্ত পেশী, অসুরের মতো শারীরিক বল একেবারে কাজের বাইরে চলে যায়। বিনোদিনীর সম্বন্ধে ওর রূঢ়তা কিছুতে যেন জোর পায় না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। তালগাছের মাথা থেকেও রোদটুকু গেল মুছে। গরুগুলি গোয়ালে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু গোয়ালটি গেছে ভেঙে। কোথায় যে তাদের বাঁধা হবে সে এক সমস্যা। নটবরের গোয়ালখানি বড়, গরু কম। সেখানে বাঁধার ব্যবস্থা বললেই হতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতে তার পা উঠল না। মানুষের কাছে মুখ দেখাতেই লজ্জা করছে। কাপাসতলার মাঠে লোকগুলোর বাঁকা হাসি বাঁকা ছুরির মতো তার বুকে বিঁধে গিয়েছে। মানুষের হাসিতে যে এত বিষ থাকতে পারে তা সে এর আগে আর কখনও উপলব্ধি করেনি। সে বিষ থেকে থেকে তার রক্তের মধ্যে চিড়িক মেরে উঠছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় হারাণ মুখ বিকৃত করছে।

ওর রাখাল বোধ হয় মহেশ্বরের গানের আখড়ায় যাচ্ছিল। ঠিকে রাখাল দুপুরবেলা একবার গরুগুলো মাঠে চরিয়েই খালাস। এর জন্যে মাসে দু-আনা করে পায়। হারাণ তাকে ডাকলে:

—কোথা যাচ্ছিস?

—কোথাও যাইনি। কেন?

—গরু ক'টা নটবরের গোয়ালে বেঁধে দিয়ে আয় তো।

গরুর দড়ি খুলতে খুলতে রাখালটা বললে, কিছু বলবে না তো?

—না, না। আমার নাম করিস। আর শোন, গরুগুলো বেঁধে দিয়েই পালাস না যেন। আমি খড় কেটে রাখছি, খোল-পানিও দিয়ে আসবি।

চিরদিন প্রত্যহ সন্ধ্যায় সে নিজের হাতে গরুগুলোকে খেতে দেয়। পরের হাতে এ ভার দিয়ে ভরসা পায় না। হয়তো গরুর পেট ভরবে না। আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। হয়তো রাখাল ছোঁড়াও এই ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত হচ্ছে। একটা কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। নিজের প্রত্যেক কাজে সে নিজেই লজ্জিত হচ্ছিল। এই ছেলেটার সামনেও সে লজ্জা ঢাকবার জন্যে বললে :

—সমস্ত দিন মাঠে-মাঠে জলে-কাদায় ঘুরে শরীরটা কি রকম যেন করছে।

রাখাল ছোঁড়া হা না কিছুই না বলে গরু বাঁধতে চলে গেল। হারাণ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শানি কাটতে বসল।

খানিক পরে তার মনে হল, সম্মুখে কিসের যেন ছায়া পড়ল। সাদা কাপড় পরে কে যেন সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। সেদিকে না চেয়েই হারাণ বুঝলে, বিনোদিনী। সে বঁটির উপর আরও ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে খড় কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বিনোদিনী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, মাঠে কি করে এলে বলবে না ?

হারাণ কোনো উত্তর দিলে না। আরও জোরে জোরে খড় কাটতে লাগল।

—বলবে না ? তোমার পায়ে পড়ি বল। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছে।

কান্নায় বিনোদিনীর স্বর ভেঙে এল।

সেই স্বরে বোধ হয় হারাণ চঞ্চল হয়ে উঠল। নিজেকে শক্ত রাখবার জন্যে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। হারামজাদী, বেশ্যা'মাগী কোথাকার !

বিনোদিনীর পিঠে যেন চাবুক পড়ল। সে চমকে উঠল। এই কদিনে তার মিথ্যা কলঙ্ক-কাহিনী সে নিজেই বিস্মৃত হয়েছিল। বিবর্ণ মুখে শুষ্ককণ্ঠে কি যেন বলতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার হল না।

হারাণ বিনোদিনীর মুখের দিকে চাইতে পারেনি। তার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই ফাঁপা বোধ হল। যেন যথেষ্ট ওজন নেই। ভয় হল বিনোদিনীও হয়তো তার দুর্বলতার কথা টের পেয়ে থাকবে। তাই আবার বললে,

—তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। তোর মুখ দেখতে চাই না। রাক্ষুসী, আমার অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি। আমার ছেলেমেয়ের মুখ নামালি। তোর মুখ দেখলে পাপ হয়।

বিনোদিনী কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষণপরে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, তুমিও এ কথা বিশ্বাস করলে ?

শান্ত কণ্ঠস্বর। ক'টি মাত্র কথা। এরই মধ্যে যেন তার শেষ আশার, তার সমস্ত আশার সমাধি সূচিত হল। এতদিন ধরে আপনার মনে মনে কলঙ্ক-প্রচারকদের সঙ্গে কলহ করে করে যেন সে জর্জ্জর হয়ে পড়েছে। কথা বলার আর শক্তি নেই। বুঝি প্রয়োজনও নেই।

কিন্তু হারাণের রক্ত তখন মাথায় চড়েছে। খড় কাটা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। বদ্ধ মুষ্টি আস্ফালন করে বললে,

—বিশ্বাস করব না? দেশসুদ্ধ লোক বিশ্বাস করেছে। এক লাঠিতে তোমার মাথা ছাতু করে দোব জান না? তোমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দোব জান না? তোমার এক হাত জিভ টেনে বার করব তবে আমার নাম হারাণ মোড়ল। তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে। নেকাল যা!

তেমনি শান্ত কণ্ঠে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলে, হাবল মেনী?

হারাণ ডান হাতটা বাইরের উদ্দেশে আস্ফালন করে বললে, ওরে সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তুই নিজের পথ দেখ।

—বেশ!

বিনোদিনী যেন একটা গভীর আরামের নিশ্বাস ছাড়লে। হাবল মেনীর ভার নিতে না হওয়ায় সে বেঁচে গেল। এত দুঃখেও সে যেন হারাণের সম্বন্ধে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করলে। এটুকু অনুগ্রহও তো সে না দেখালেও পারত! হাবল মেনীকে নিয়ে তা হলে সে যেত কোথায়?

সে আর একবার যেন আপন মনেই বললে, বেশ!

তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

কতকগুলো কড়া কড়া কথা বলে হারাণও যেন অনেকটা হালকা বোধ করল। বিনোদিনীকে যথেষ্ট অপমান করা হয়েছে। তার পাপের অবশ্য সীমা নেই। মেয়েমানুষের চরমতম অপরাধে সে অপরাধিনী। তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও দোষ হয় না। কিন্তু সে তো আর সত্যিই সম্ভব নয়। স্ত্রীহত্যা করতে আর যে পারে সে পারুক, হারাণ পারে না। তবে যে অপমান সে তাকে করেছে আর যে ভয় দেখিয়েছে, ও যদি মানুষ হয় তা হলে আর কখনও কারও দিকে ফিরেও চাইবে না।

হারাণ সশব্দে উরুতে দুহাত ঝেড়ে যেন সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত দুঃখ ঝেড়ে ফেলে দিলে। রাখাল ছোঁড়া এল গরুর জন্যে শানি নিয়ে যেতে। কিন্তু হারাণের আর তার সাহায্যের দরকার হল না।

ঘাড়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, আর দরকার হবে না। তুই যেখানে যাচ্ছিলি যা। আমি নিজেই দিয়ে আসছি।

হেসে বললে, নিজের হাতে গরুকে না খাওয়ালে আমার মনস্তর হয় না। তুই যা।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটি নক্ষত্রেরও দেখা নেই। সমস্ত নক্ষত্রগুলো কে যেন কাদা দিয়ে লেপে বন্ধ করে দিয়েছে।

সমস্ত রাত্রি বিনোদিনী একটি বারও চোখের পাতা বোজেনি। নানা চিন্তা তার মাথার ভিতর সাপের মতো কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার পরে সে হারাণের জন্যে ভাত বেড়ে দিয়েছে, কিন্তু সামনে আসেনি। রাত্রে কিছু খায়ওনি। কেবল একটুখানি মাছের আঁশ দাঁতে কেটেছে। খাওয়া-দাওয়ার পরে হারাণ হাবল মেনীকে নিয়ে ঘরে শুতে গেছে। তার অনেক পরে বিনোদিনী গিয়ে চুপি চুপি পাশের ঘরের শুধু মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল।

নামেই শোয়া। ঘুম তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালিয়েছে। তার মনে ঠিক যে কি হচ্ছে বলা অসম্ভব। বহু ভাবের সংঘাতে মন স্থাণুর মতো অচল অনড় হয়ে গেছে। তার মধ্যে কোনো একটা ভাবেরই প্রাধান্য নেই। কোনো জিনিসই সে স্পষ্ট করে ধারণা করতে পারছে না। কোনো একটা চিন্তারই শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারছে না। এলোমেলো হয়ে আসছে বিভিন্ন চিন্তা। সূত্র বারে বারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু আগে সে কি কথা ভাবছিল একটু পরে আর তা কিছুতে মনে করতে পারছে না।

কারও পরে তার রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই। কখনও স্বামীর প্রতি অভিমানে চিত্ত তার উদ্বেল হয়ে উঠছে। শেষে আর সকলের মতো সেও তাকে ভুল বুঝলে? এতদিনের একত্রবাসের পরেও হারাণ তাকে চিনতে পারলে না? শেষে কি হারাণের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে প্রমাণ দিতে হবে সে অপরাধ করেনি, সে অসতী নয়? ধিক তাকে! তার জীবনে ধিক! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। আবার তখনই হারাণের প্রতি করুণায় তার বুক ভরে আসছে। সে বুঝি তারও চেয়ে অসহায়! এ পৃথিবীতে কে কার অপরাধের প্রমাণ চায়? মানুষের নামে অপবাদই যথেষ্ট। শোনামাত্র লোকে বিশ্বাস করবে। প্রমাণ চাইতে যাওয়াটাই হাস্যকর। এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে হারাণ নিজেও পড়েছে। অপবাদে বিশ্বাস করা

তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর বিশ্বাস না করলেই বা করবে কি? সমাজের মধ্যে ব্যক্তি অসহায়। কাল পাঁচ বাড়ির কাজে হারাণের নিমন্ত্রণ বন্ধ হবে। হারাণের বাড়ির কাজে কেউ খেতে আসবে না। এর চেয়ে কঠোর শাস্তি সমাজ আর কল্পনা করতে পারত না। এর বিরুদ্ধে চলবার সাহস কোনো মানুষের নেই। এ শাস্তি বইবার শক্তি কোনো মানুষের নেই। সমাজে গায়ের জোর খাটে না। হারাণ করবে কি? সে বিনোদিনীর চেয়েও অসহায়।

হারাণের উপর তার রোষ নেই। সমাজের উপরও না। সমাজ একটা যন্ত্র। নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। রসিকের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও তার রাগ হয় না। সে যা দেখেছে তাই রটিয়েছে। বিনোদিনীর চোখেও যদি অমনি দৃশ্য পড়ত সে নিজেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করত। এ সমস্ত বিষয়ে সকল মানুষের প্রবণতাই একমুখী। যতই সে ভেবে দেখে, সমস্ত ক্ষোভ একটি একটি করে তার মন থেকে শুকনো পাতার মতো ঝরে ঝরে পড়ে। কিন্তু তবু মন কিছুতে পরিষ্কার হয় না। ক্ষোভ গিয়েও যায় না। কি যেন একটা অজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে থেকে থেকে মন বিদ্রোহ করে ওঠে। তার হাতের মুঠা দৃঢ়বদ্ধ হয়, চোখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোয়, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে, তার পরে ঝর ঝর করে নিরুপায় রোষে কেঁদে ফেলে।

ভাগ্য তাকে বঞ্চিত করেছে, সমাজ তাকে লাঞ্ছিত করেছে, যার মধ্যে অপরাধের বাষ্পও নেই লোকচক্ষে তাই অপরাধ বলে নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হয়েছে। কেন? এমন হয় কেন?

বাইরে অন্ধকার রাত্রি। আকাশে এখনও তেমনি থমথমে মেঘ করে আছে। ঝোপে ঝাড়ে পাতায় পাতায় জোনাকিরা দলে দলে উড়ছে আর বসছে। পিছনে ডোবার ধারে ব্যাঙ ডাকছে একঘেয়ে ছেদহীনভাবে। হাওয়ার দোলায় বাঁশের ঝাড় থেকে কট কট শব্দ হচ্ছে। আর তার পাতাগুলো থেকে উঠছে খস খস শব্দ। আন্দোলিত তেঁতুলগাছ থেকে মাঝে মাঝে উঠছে মর্মরধ্বনি।

সমস্ত পৃথিবীর মুখে কে যেন কালি লেপে একাকার করে দিয়েছে। বস্তু থেকে বস্তুকে পৃথক করে চেনা যাচ্ছে না। তাদের পৃথক সত্তা বোঝা যাচ্ছে শুধু শব্দে। শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি তেঁতুলগাছ, ওটি বাঁশের ঝাড়, আর ওই দূরেরটি বারোমেসে তাল গাছ।

এ একপ্রকার ভালোই হল। পরিচিত বেষ্টনী থেকে নিঃশব্দে একান্ত চুপে চুপে বিদায় নেওয়ার সুবিধা হবে। এই সংসারে সে এসেছে নিতান্ত কচি বয়সে।

তখন তার বয়স বারো কি তেরো। এত অল্প বয়স থেকে স্বামীর ঘর কেউ করে না। তাকে নিতান্ত দায়ে পড়েই করতে হয়েছে। স্ত্রীবিয়োগের পর হারাণের সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেউ রইল না। সংসার অচল। তাই সেই বয়সে এসেই তাকে এই শূন্য সংসারের ভার বইতে হয়েছে। সেই থেকে সে ভার আর তার কাঁধ থেকে নামেনি। যদি কখনও কোনো বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে বাপের বাড়ি গিয়েছে, দুদিনের উপর তিন দিন থাকতে পায়নি। হারাণ তার সঙ্গে গেছে, আবার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সেই থেকে দীর্ঘকালের অবস্থানে তৃণটির সঙ্গে পর্যন্ত তার নাড়ীর যোগ ঘটেছে। ও-কোণের ডুমুরগাছটি তার নিজের হাতে লাগানো। আজ সেই গাছে দিচ্ছে ফল। কুমড়োগাছের চারাগুলি তার নিজের হাতে পোঁতা। আজ তার লতা মাচা ছেয়ে পাঁচিল বেয়ে লিকলিক করে বেড়াচ্ছে। ফুল ধরেছে কত! আর জালি ধরেছে আঠারো গণ্ডা। আর দুদিন পরে সেগুলো কত বড় হবে। কিন্তু সে আর খাবার জন্যে থাকবে না। শুধু কি কুমড়ো? বেগুনগাছে ধরেছে বুড়ো আঙুলের মতো সরু সরু বেগুন। মরিচগাছে থোলো থোলো মরিচ। সিম এবারে হয়নি। যেগুলো হয়েছিল তার গায়ে গায়ে কি এক রকমের কালো কালো বিন্দু বিন্দু পোকা এত হয়েছিল যে, একটি সিমও কেউ মুখে দিতে পায়নি। সে দুঃখ সে এখনও ভুলতে পারেনি। এই সব গাছের গোড়ায় সে কি কম জলটা ঘড়ায় ঘড়ায় দিয়েছে?

বিনোদিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এ সব কথা ভোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু হাবল মেনীকে কি করে ভুলবে? সকাল হলেই তারা সর্বপ্রথম খুঁজবে তাকে। দুটি মুড়ির জন্যে কাঁদবে। টিনে মুড়ি যা রয়েছে তাতে এখনও কদিন হয়তো চলবে। তারপরে হয়তো পাড়ার কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে দুটি মুড়ি ভেজে দেবার জন্যে। বিনোদিনীর দুঃখ হল কেন সে আরও এক খোলা মুড়ি ভেজে রাখেনি। কিন্তু তাও যেন হল। তারপরে হারাণ যখন মাঠে যাবে! সে তো আর দিন রাত্রি ওদের আগলাবার জন্যে বাড়িতে বসে থাকতে পারে না! তখন কার কাছে থাকবে ওরা? ওরা যে মায়ের অভাবে মুখ নামিয়ে বেড়াবে, কে ওদের কোলে নেবে? কিন্তু হারাণ বলেছে সে ভাবনা ওকে ভাবতে হবে না। হয়তো আর একটা সে বিয়ে করবে। বেটাছেলের আবার বিয়ের ভাবনা! হারাণের এমন কিছু বিয়ের বয়স যায়নি।

বিনোদিনী অবাক হল, হারাণের বিয়ের আশঙ্কায় তার মনে এতটুকু ঈর্ষা হল না। হারাণের সঙ্গে তার যোগসূত্রের মধ্যে এতদিনের একত্রবাসের পরেও কোথায়

যেন ফাঁক আছে। এক চুল ফাঁক। নজরে পড়ে না। কিন্তু আছে। হারাণ যদি আবার বিয়ে করতে চায়, যেন করে। বিনোদিনী তাকে সুখী করতে পারেনি। যাবার সময় তো মর্মান্তিক লজ্জা দিয়েই যাচ্ছে। নতুন বউ এসে যেন তাকে সুখী করতে পারে। বিনোদিনী বিনোদরায়ের চরণে হারাণের জন্যে এই ঐকান্তিক প্রার্থনা জানালে। আর প্রার্থনা জানালে হাবল মেনীর জন্যে। ভগবান যেন ওদের সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

পূর্বদিকে শুকতারা উঠেছে। ওরা বলে ভুল্‌কো তারা। রাত আর তা হলে বেশী নেই যাকে বলে হাঁড়ি-তোলা রাত, তাই। এইবার বেরুতে হচ্ছে। নইলে আর একটু পরেই মেনী উঠবে। মেয়েটা যেমন সকালে শোয়, তেমনি সকালে ওঠে। এখনও অন্ধকার একটু আছে বটে। কিন্তু কাঞ্চনপুরে ঘাটে পৌছলেই ফরসা হয়ে আসবে। এইটুকু একটু অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। কে জানে, হয়তো কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে। বলা তো যায় না। এদিকের অনেক লোক তার পরিচিত। তাকেও অনেকে দেখেছে। আলোতে দেখলে চিনে ফেলতে পারে।

বিনোদিনী পর্দানশীন মেয়ে নয়। সাধারণতঃ হেঁটেই এখানকার মেয়েরা যাতায়াত করে। সুতরাং রাস্তা অপরিচিত নয়। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে লোকাল বোর্ডের যে কাঁচা সড়ক, সেটা সোজা গিয়ে থেমেছে কাঞ্চনপুরের ঘাটে, ময়ূরাক্ষীর ধারে। মধ্যে আর কোনো গ্রাম নেই, একটি মাত্র মাঠ। এই পথে সে কতবার গেছে বুড়ো শিবতলা, বাবা বুড়ো শিবের মাথায় জল দিতে। এই পথেই যেতে হয় ললিতাদের আখড়া। ললিতার কাছ থেকেই এ কথা শুনেছে। নদী পার হয়ে বাঁ দিকে চওড়া গোছ আল গেছে বুড়ো শিবতলা। আর কাঁচা সড়কটা গেছে ললিতাদের গ্রামে। একেবারে সোজা রাস্তা। কাকেও জিজ্ঞাসা করার পর্যন্ত প্রয়োজন হবে না।

শেষের দিকে সে ললিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। বরং একপ্রকার মন্দ ব্যবহারই করেছে বলতে হবে। তবু যে কলঙ্ক-পসরা মাথায় নিয়ে সে গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছে, সে কলঙ্ক মিথ্যে হোক আর যাই হোক, তার পরে যদি নির্ভয়ে এবং সসম্মানে কেউ তাকে আশ্রয় দিতে পারে সে মা নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, আত্মীয়স্বজন তার সমাজের কেউ নয়—সে ওই ললিতা। সে-ই কেবল কাউকে ভয় করে না। বিনোদিনীরও একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়ের বেশী আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। পাঁচ বাড়ির ধান ভেনে, জল তুলে সে স্বাধীনভাবে এবং সসম্মানে নিজের জীবিকা

অর্জনে সক্ষম। দুবেলা দুমুঠো ভাতের ভাবনা তার নেই—অন্ততঃ দেহে যতদিন শক্তি আছে।

সঙ্গে একখানা বাড়তি কাপড় শুধু নেবার প্রয়োজন। আর একখানা গামছা। ভাদ্র মাসের তীক্ষ্ণ রোদ। গামছাখানা মাথায় দেবার দরকার হতে পারে। কাপড়খানি গামছায় বেঁধে একটা পুঁটলি করে আগে থাকতেই সে রেখে দিয়েছিল। সেটি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার অল্প একটুখানি ফিকে হয়ে এসেছে। ঝোপ-ঝাড়, কুমড়োর মাচা, শাকের খেত, তেঁতুলগাছটি এখন বোঝা যাচ্ছে। বিনোদিনী সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে। হাবল মেনাকে একবার কোলে নিয়ে শেষবারের জন্যে চুমু খেয়ে যাবার জন্যে তার বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠল। কিন্তু টন টন করলেও নিজেকে যেন সে জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে চলল খিড়কির পথে।

দরজা খুললেই তাদের ডোবা। তার পর বাঁশের ঝাড়, ক'টি চারা তালগাছ। তার নীচে তাদের কনকচূরের বড় জমিখানা। তার পরে···

তার পরে অবারিত মাঠ···

সকালে উঠেই হাবল মেনী মাকে খুঁজতে লাগল। হারাণ উঠে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। ঘর খালি। ভাবলে, বোধ হয় ঘাটে গেছে। মাঠে তার কাজ আছে। তবু একটু দেরি করতে লাগল। সকালে বিনোদিনীকে একবার না দেখলে তার মনটা ঠাণ্ডা হবে না। কিছু বলবে না, শুধু একবার চোখের দেখা দেখেই আশ্বস্ত হয়ে মাঠে যাবে। হারাণের রাগ খড়ের আগুনের মতো। জ্বলে উঠতেও যতক্ষণ, নিবতেও ততক্ষণ। এখন আর তার রাগ নেই। কিন্তু বিনোদিনীর সম্বন্ধে তার একটু ভয় হয়েছে। রাগলে বিনোদিনী চাৎকার করে ঝগড়া করে, ঝগড়া করে অনেক রাত পর্যন্ত। গত রাত্রে কিন্তু সে সব কিছুই করেনি। শুধু জলভরা থমথমে মেঘের মতো নিঃশব্দে সরে গেছে।

ঘাট থেকে ফিরে এসে হাবল কাঁদতে কাঁদতে বললে, ঘাটে মা কই ?

হারাণের বুকটা দমে গেল। মুখের ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তা হলে বোধ হয় ও-বাড়ি গেছে।

হাবল কাঁদতে কাঁদতে বাইরে গেল। হারাণও মাঠে যেতে পারলে না। আর একটু অপেক্ষা করলে। কিন্তু তার ভয় হল। সূর্য উঠেছে। যেখানেই

বিনোদিনী যাক, এতক্ষণ তার ঘর-দোর নিকুনো শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আজ এখনও দোরে জল পড়েনি। নিকুনো চুলোয় যাক।

মেয়েরা যেন মাছির দল। কোথাও এক ফোঁটা রস পড়লে কি করে যেন টের পায়। দেখতে দেখতে তারা একটি দুটি করে এসে জমতে লাগলো। প্রশ্নের পর প্রশ্নে হারাণকে ছেয়ে ফেললে। কিন্তু হারাণ তাদের একটি কথারও জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ করলে না। মাথায় হাত দিয়ে স্তব্ধ ভাবে বসে রইল।

বিনোদিনীর পলায়নের কারণ তাদের অজ্ঞাত নয়। তারাপদ-সংক্রান্ত কথাটা যে হারাণের কানে গেছে তাও তারা জানে। বস্তুতঃপক্ষে গত রাত্রে এ নিয়ে হারাণের বাড়িতে চীৎকার, কান্নাকাটি, প্রহারের শব্দ না ওঠায় প্রতিবেশিনীরা দস্তুরমতো চিন্তিত এবং হতাশ হয়েছিল। এখন বুঝে আশ্বস্ত হল, প্রকাশ্যে কোনো গোলযোগ না হলেও ভিতরে ভিতরে কিছু একটা হয়েছে। নইলে বিনোদিনী পালাবে কেন?

কিন্তু কার সঙ্গে পালাল? তারাপদ বাড়িতে আছে এ তারা স্বচক্ষে দেখেছে। অন্ধকার রাত্রে একা পালানো কম সাহসের কথা নয়।

—ধন্যি বুকের পাটা মা! কোলের মানুষ দেখা যায় না এমনি অন্ধকার! —ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল।

—বটে মা! ছেলেপিলে নিয়ে থাকি, তাই রাত্রে জানালা খুলে শুতে গা ছম ছম করে!…

—একলা না আরও কিছু! তুমি যেমন নেকী!—আর একজন ঠোঁট উল্টে বললে।

—একলা গো! ছোঁড়া বাড়িতে রয়েছে যে!—চুপি চুপি অপর জন উত্তর দিলে।

—অমন কত ছোঁড়া আছে, তার খবর রাখ?

—বটে দিদি।

কিন্তু হারাণের ধারণা সে মরেছে। ময়ূরাক্ষীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। যা অভিমানী মেয়ে, মুখ নামিয়ে কারও বাড়ি সে থাকতে যাবে না। নদীর জলে ডুবে মরা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এই নিবিড় অন্ধকারে মরণ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোক একা ঘরের বার হতে পারে?

হারাণ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। দাওয়া থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে টলতে টলতে ছুটল নদীর ঘাটের দিকে। তাকে থামায় কার সাধ্য! সে উচ্ছ্বসিত

হয়ে দমকে দমকে কাঁদে আর বলে, সে নিশ্চয় নদীর জলে আত্মহত্যা করেছে গো। মরে আমার হাত থেকে বেঁচেছে। এতক্ষণে তার দেহ নদীর জলে ভেসে চলেছে।

হারাণ ছুটল। তার কাপড় আলুথালু। কে বা খেয়াল করে আঁস্তাকুড়, কে বা খেয়াল করে কাঁটাবন। কত কাঁটা যে তার পায়ে বিঁধল তার ইয়ত্তা নেই। দৃষ্টি তার ময়ূরাক্ষীর স্নানের ঘাটের দিকে নিবদ্ধ। সেই দিকে লক্ষ্য করে কাঁদতে কাঁদতে সে ছোটে। তার পিছনে গ্রামের বহু লোক। কেউ শত্রু, কেউ মিত্র। কেউ টিপে টিপে হাসে, কেউ তার দুঃখে কাতর।

এমনি করে ছেলেতে-মেয়েতে, বুড়োতে-বুড়ীতে, পুরুষে-স্ত্রীলোকে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ল ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

কিন্তু ময়ূরাক্ষীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যৌবনমদমত্তা নাগরীর মতো সে চলেছে আপনার মনে বয়ে। কত নরনারী তার দিকে চেয়ে রয়েছে সেদিকে খেয়াল করার অবসর তার নেই। আপনার ভরন্ত রূপের নেশায় আপনি আচ্ছন্ন। তার নিস্তরঙ্গ জলরাশি চলেছে নিঃশব্দে। তার গতির বেগে এপারের তীরভূমির তলদেশ যাচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে। ভুমদাম, ছপাৎ-ছপাৎ করে থেকে থেকে পাড় পড়ছে ভেঙে। হাজার হাজার ঘূর্ণি নাভিকুণ্ডের মতো জাগছে, আর মিলিয়ে যাচ্ছে। খেয়া-নৌকাখানি ঢিমে তালে পারাপার করছে। তার দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে ছপ ছপ। তার গায়ে ধাক্কা লেগে ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে পড়ছে ছলাং ছল। ধুতুরাফুলের মতো ফেনপুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।

প্রভাতের নদীতীর। অনতিদূরের বুড়া বট, করবীগাছের ঝাড, বনফুলের ঝোপগুলো যেন সবে নিদ্রা ভেঙে উঠছে। বধূ ময়ূরাক্ষীরও চোখে ঘুম যেন জড়ানো। তার নিস্তরঙ্গ গতিবেগে রয়েছে আলস্যের আমেজ। গত রাত্রের বাসর-শয়নে কবরী গিয়েছে খুলে। শিথিল কেশ-পাশ কোনোরূপে বেঁধে সে যেন নেমেছে কাজে। সুখ-স্মৃতির ছোঁয়া লেগে মাঝে মাঝে উঠছে চমকে।

তার ধারে ধারে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে হারাণ। আর তার পিছনে গোটা গ্রামের নরনারী। হতাশ হয়ে এসে তারা শ্মশানের ধারে গিয়ে বসল। এইখানটায় নদী পূর্বদিকে বেঁকেছে। বাঁকের মুখে বিনোদিনীর মৃতদেহ আটকে যাওয়া সম্ভব।

কিন্তু ময়ূরাক্ষী চলেছে ছলনাময়ী নারীর মতো। তার ভিতরে কোথাও যদি বিনোদিনী লুকিয়েও থাকে বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝবার যো নেই। তবু

সবাই চেয়ে রইল। দহের জলে যদি বিনোদিনী ডুবে থাকে, এখানে ভেসে আসতে সময় নেবে।

হারাণের চোখে পলক পড়ে না। আর সকলে এদিক ওদিক চাইছে। নদীর জলে টুপটাপ করে দু-একটা ঢিল ছুঁড়ছে। কিন্তু হারাণ স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল। দূরে বাঁকের ওদিকে কালো মতো কি যেন একটা ভাসতে ভাসতে আসছে।

আসছে বটে। হয়তো বিনোদিনীর মেঘের মতো কালো চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে!

হারাণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তার পিছনে আরও অনেক লোক। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, কালো বটে। কিন্তু বিনোদিনীর কালো কেশের রাশি নয়, একটি করবী গাছের ঝাড়। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। তার লাল লাল ফুলগুলি পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার ফিকা হাসির মতো থেকে থেকে দেখা যাচ্ছে।